

থাকছে :

ওমর আলী আশরাফ
যাবীন তাসনিম ঘলানী
শাহনাজ খুশী
এবং আরও অনেকের লেখা...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মার্চ ২০২২

আজ

“ ভাইয়ে ভাইয়ে শবা এক দেহ
শবা সীমাচালা পাঠীৰ
তব মিলাবে ছায়া আৱশ্যতাল
সেদিন বোজ শৰ্মাৰ ”



କିଞ୍ଚିତ୍ କଥା...

ମାନୁଷ ସାମାଜିକ ଜୀବ । ନିଜେର ସକଳ ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣେଓ ସ୍ଵଜାତିର ସାହାୟେର ମୁଖାପେକ୍ଷା । ସମାଜବନ୍ଦ ଏହି ଜୀବନେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ବଜାୟ ରାଖିତେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ହଲୋ, ପାରମ୍ପରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ୟ ଓ ଭାଲୋବାସାର ସମ୍ପର୍କ ମଜୁତ କରା । ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତେ ଏବଂ ମାନୁଷେ ମାନୁଷେର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଆମାଦେର ସୁନ୍ଦର ପଥ ଦେଖିଯେଛେ । ବଲେଛେନ, ଇସଲାମେର ବନ୍ଧନେ ଆବନ୍ଦ ହତେ । ମୁସଲିମଦେର ପାରମ୍ପରିକ ଏହି ସମ୍ପର୍କକେଇ ବଲା ହୁଯ ଭାତ୍ତ । ବଂଶ-ବର୍ଗ-ଦେଶ-ଭାଷା-ର ସୀମାବନ୍ଦତାର ଉତ୍ଥରେ ଏହି ଭାତ୍ତ । ମୁସଲିମାନେର ଏହି ଭାତ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ହଲୋ ଈମାନ । ଈମାନେର କାରଣେଇ ଏକ ମୁସଲିମାନ ଅପର ମୁସଲିମାନକେ ଭାଲୋବାସବେ, ତାକେ ବିପଦ - ଆପଦେ ସାହାୟ କରିବେ । ମୁମିନ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀର ଯେ ସୀମାନାତେଇ ଥାରୁକ ନା କେନ, ତାର ଗାୟେର ରଙ୍ଗ ଯା-ଇ ହୋକ ନା କେନ, ସେ ଆମାଦେର ଭାଇ ।

ବିଦାୟ ହଜ୍ଜେର ଭାଷଣେ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାଲ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେନ,

“...ହେ ମାନବ ସକଳ! ନିଶ୍ଚୟଇ ତୋମାଦେର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏକଜନ, ତୋମାଦେର ଆଦି ପିତା-ଓ ଏକଜନ । ମନୋଯୋଗ ଦିଯେ ଶୁଣେ ରାଖୋ, ଆରବେର ଓପର ଅନାରବେର ଏବଂ ଅନାରବେର ଉପର ଆରବେର କୋନୋ ରକମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବ ନେଇ । ତେମନିଭାବେ କାଳୋର ଉପର ସାଦାର ଅଥବା ସାଦାର ଉପର କାଳୋର କୋନୋ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବ ନେଇ । ତାକୁୟା ଓ ପରହେଜଗାରିତାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବର ମାପକାର୍ତ୍ତ । କେନନା ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ ମେଇ ବେଶି ସମାନିତ, ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଆଲ୍ଲାହଭୀରୁ”- ମୁସନାଦେ ଆହମାଦ (୨୩୪୮୯)

প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাহর নিকট এই ঈমানী ভাতৃত্বের বন্ধন মানবজাতির সফলতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এই সফলতা পেতে আমাদের-তোমাদের পালন করতে হবে আল্লাহ-র দেয়া কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভাই হয়ে ভাইয়ের পাশে থাকতে হবে, ভাই-এর দুঃখে সান্ত্বনা দিতে হবে, বিপদে- আপদে সহায়তা করতে হবে, আমাদের ভাইদের মধ্যে যারা মায়লুম তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে; সাধ্য অনুযায়ী জালেম-কে প্রতিহত করতে হবে, যেসকল ভাইয়ের দ্বীনে ফেরার আহ্বান দরকার, দাওয়াতি নীতি মেনে তাদের দ্বীনে ফেরার দাওয়াত দিতে হবে।

আমাদের লক্ষ্য হবে, সকল ভাইদের নিয়ে একসাথে জানাতে যাওয়া। এক্যবন্ধ থাকা। যে কালিমার দাবি অনুযায়ী আমরা নিজেদের মুমিন হিসেবে পরিচয় দিচ্ছি, মুসলমান বলছি। সেই কালিমার দাবি পূরণ করতেই আমাদের পারস্পরিক ভাতৃত্ব সুদৃঢ় করতে হবে। শত বাধা উপেক্ষা করে এই সম্পর্ক রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। নিজেদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়তে হবে।

-টিম ঘোলো



Click Here

এবাবের সংখ্যায় যা যা থাকছে.....

কে প্রকৃত অপরাধী?

হৃদয়ে ধারণ করো!

ভুল হলে ফুল হয়ো।

খুলি মেঘের ভাঁজ। (তৃতীয় পর্ব)

মহানবীর (সাঃ) মহানুভবতা। (প্রথম পর্ব)

বাড়িয়ে দাও তোমার হাত।

ফিতরাত : সহজাত প্রবৃত্তি।

পিঁপড়ার সারিতে আলোর খোঁজে

ভাতৃত্ব : ধর্মীয় বন্ধনের এক বৃহৎ পরিবার।

সৌরজগতে গ্রহ কয়টা?

পড়তে পারো নিচের বইগুলো।

শব্দখেলা।

আমাদের এষ্টিভিটি।



কে পঞ্চত সপ্রবাধি?

-যাবীন তাসনিম এলাহী
একাদশ শ্রেণি,
ডিকারননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

আমি অনেক ভালো লিখতাম এমন না। স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য একবার লিখলাম। পরদিন স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের দেখলাম, সবাই আমার লেখার প্রশংসা করতে লাগল কিন্তু একজন বলল, ‘কেন জানি লেখাটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় এটা অমুক লেখকের লেখা।’ আমি তার কথা শুনে রীতিমতো লজ্জায় পড়ে গেলাম।

সত্যি বলতে, লেখাটা পুরোপুরি আমার ছিল না। একজন ভারতীয় লেখকের একটা গল্প থেকে ধার নেওয়া ছিল। আমি খুব ভালো করেই জানতাম, আমার বান্ধবীরা কখনোই ‘প্রচেত গুপ্ত’র লেখা পড়েনি। এমনকি কখনো নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ আছে। আমার মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেল। আমি ক্লাসের মেধাবী শিক্ষার্থীদের একজন ছিলাম। এ কারণে অন্যরকম এক গর্ব কাজ করতো আমার মাঝে।

শুধু তাই নয়, ওই মেয়েটা ছিল তুলনামূলক দুর্বল ছাত্রী। ওর এরকম একটা কথায় যা তা বললাম। আমার ‘মেধাবী’ গ্রন্থে একই কারণে তাকে আচ্ছামত ধোলাই দিল।

তাতেও তার প্রতি আমার রাগ কমলো না আরেকদিন কী হলো, ক্লাসে যারা বই আনেনি তাদের দাঁড়াতে বলা হলো। যারা বই আনতো না, বাংলা ম্যাম তাদের খুব পিটুনি দিতেন। আমার কাছে দুটো বাংলা বই ছিল। ভুলে নিয়ে এসেছিলাম। ম্যামের ভয়ে সবাই বই আনতো। কিন্তু ওইদিন ঘটনাক্রমে ওই মেয়েটাই বই আনেনি। সে আমার সামনের বেঞ্চে বসা ছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, সে ব্যাগ হাতিয়েও কোনোভাবেই বই খুঁজে পাচ্ছে না। আমি মনে মনে খুশি হলাম এটা ভেবে, আজকে তার শাস্তি হবে। এবং হলোও তাই। পিটুনি খাওয়ার পর তার চেহারাটা ছিল দেখার মতন।

আমার দারুণ খুশি লাগছিল। আমাকে অপমান করার শাস্তি পেয়ে গেল—এরকম কিছু ভেবে আত্মত্পূর্ণ টেকুর তুলতে লাগলাম।

আমি সাধারণত বছরের শুরুর দিকে ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতাগুলো পূরণ করে রাখতাম। এতে পরীক্ষার সময় চাপ কমতো। একবার হলো কী! জীববিজ্ঞান ব্যবহারিকের আগের রাত। বান্ধবীর বাসায় দাওয়াত ছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষে গল্প করলাম অনেক রাত পর্যন্ত। সারাদিনের ক্লান্তি এখনো কাটেনি। রাতে হঠাৎ ফোন করলো ওই মেয়েটা। আমি তার সাব-গ্রুপের লিডার ছিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ৮ নম্বর ব্যবহারিকের ছবিটা আমি তাকে পাঠাতে পারব কিনা। দুর্বল ছাত্রী, আর আমিও ছিলাম ক্লান্ত। বললাম পরে দিন কী মনে করে ব্যবহারিকের খাতা খুললাম। খাতা খুলে চক্ষু চড়কগাছ! আমার খাতা শুন্য! একটাও করা হয়নি! আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি এবার আগে করে রাখিনি। এখন আমি ক্লান্ত, তার উপর এতগুলো করা কীভাবে সম্ভব? আমি এখন কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ পর মেয়েটা আবার ফোন দিল। আমি কিছু না ভেবেই বললাম, ‘আমার একটাও করা নেই। আমি এখন কী করব?’ চিন্তায় আমার তখন পাগলপ্রায় অবস্থা। মেয়েটা আমাকে বলল, সে আমাকে সাহায্য করবে। আমি যেন প্রথম ৩ টা করে রাখি। বাকিটা সে করে দিবে। আমি তখনই লেখা শুরু করলাম। কিন্তু ক্লান্ত শরীর নিয়ে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারলাম না। ঘুমিয়ে গেলাম।

সকালে স্কুলে গিয়ে দেখি, আমার আগেই সে এসে বসে আছে। আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি দ্রুত তার কাছ থেকে পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে আমার সেটে লাগালাম। ফলে সেবারের মতো আমি বেঁচে গেলাম।

আসার পথে সকালের মতোই সে আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করব? কী বলব? আমি তার কাছে গেলাম। সে আমাকে ছট করেই বলতে শুরু করলো, ‘জানো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে একটা দুঃখের বছর ছিল?’

আমি শুধু বললাম, ‘হ্যাঁ’।

সে বলল, ‘নবুয়াতের দশম বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা ইন্দ্রেকাল করেন এবং এক-ই বছর ইন্দ্রেকাল করেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি একদিকে যেমন হারালেন নিজের ঘনিষ্ঠতম সহযোগীকে, অপরদিকে হারালেন দাওয়াতি কাজের একজন মজবুত শক্তি। এই কারণে সে বছর-কে শোকের বছর বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আমি নিশ্চুপ শুনছি। সে বলে গেল—‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন খায়রাজ গোত্রের ৬ জন। [১] এরপর ধীরেধীরে মদীনায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের দাওয়াত করুল করে নেয় আউস গোত্র-ও।

এই আউস গোত্রের সাথে খায়রাজ গোত্রের ছিলো দীর্ঘদিনের শক্তি। ইসলাম গ্রহণের পর সেই শক্তি বন্ধুত্বের রূপ নিলো। মদীনায় পর তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরাপত্তা দিলেন। নিরাপত্তা দিলেন মুহাজিরদের। জানো, সে নিরাপত্তা কেমন ছিল?’

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। সে বলে চলেছে—‘তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো ভাতৃত্ব। সেই ভাতৃত্ব কী অসাধারণ! আনসারীরা মুহাজিরদের এমনভাবে গ্রহণ করলেন যেন তাদের রক্তের ভাই। নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের ভূমিসহ এমন কিছু বাকি ছিল না, যা দিয়ে তারা সহযোগীতা করেনি। নিজেদের দেশ ত্যাগ করে আসা মুহাজিরদের ভাইয়ের মত আপন করে নিয়েছিলেন আনসারীরা। যাদের মাঝে ছিলো শুধুমাত্র ঈমানী ভাতৃত্বের সম্পর্ক। তাদের এই ভাতৃত্বের ইতিহাস সালমান ফারসি ও আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর একসাথে তাহাজ্জুদ আর একত্রে খাবার খাওয়ার ইতিহাস। তাদের এই ভাতৃত্বের ইতিহাস সাদ বিন রাবী’ তার মুহাজির ভাই আবুর রহমান ইবনে আউফ-কে নিজের সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবের ইতিহাস।[২]

আনসারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেন, আমাদের এবং মুহাজির ভাই-দের মধ্যে খেজুর বাগান ভাগ করে দিন। নবিজী নিষেধ করেছিলেন। তখন মুহাজিরীরা বলেন, ‘আপনারা আমাদের বাগানে কাজ করুন

আমরা আপনাদের-কে (বৃক্ষের) ফলে অংশীদার করব।’ তারা বললেন, ‘আমরা শুনলাম এবং মানলাম।’ [৩]

যুদ্ধের ময়দানেও তারা একসাথে লড়েছেন এবং একসাথেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। অপরদিকে মুহাজিররা ছিলেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এই ভাতৃত্ব ও ভালোবাসার ভিত্তি কেবল ঈমান, এর ভিত্তি কেবল তাকওয়া।’

আমি শুনছি, আগেও শুনেছি। কিন্তু এভাবে নয়। আমি মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কাল রাতে কতক্ষণ জেগে ছিলে?’

সে জবাব দিল, ‘রাতে ঘুমোতে পারিনি।’

- ‘সত্যি?’

- ‘হ্যাঁ আসলে আমি যখন ভাবলাম যে, আমাদের সাহাবীগণ কেমন ছিলেন। একে অপরের প্রতি কতটা ভালোবাসা ছিল। তখন আমার এই অপর সে জবাব দিল, ‘রাতে ঘুমোতে পারিনি।’

- ‘সত্যি?’

- ‘হ্যাঁ আসলে আমি যখন ভাবলাম যে, আমাদের সাহাবীগণ কেমন ছিলেন। একে অপরের প্রতি কতটা ভালোবাসা ছিল। তখন আমার এই অপরাধবোধ কাজ করতে লাগল যে, আমি যদি তোমাকে সাহায্য করতে না পারি, আমি নিজেকে তাদের উত্তরসূরী দাবি করতে পারব না।’

কোথেকে যেন একটা ভ্যান এসে উদয় হল।
আর আমিও তাকে বিদায় দিয়ে চলে এলাম।

আমি অপরাধবোধে ভুগছিলাম। আমার প্রয়োজনে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল, অর্থচ আমি তার প্রয়োজনে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করিনি। তাকে বিভিন্নভাবে অপদস্থ করেছি। বাসায় গিয়ে একটি হাদিস পড়লাম, ‘পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা আর সংযোগিতার দিক থেকে মুমিনদের দ্রষ্টান্ত একটি দেহের ন্যায়। দেহের কোনো একটি অঙ্গ বেদনাগ্রস্ত হলে জ্বর ও অনিদ্রায় পুরো দেহই বেদনাগ্রস্ত হয়ে যায়।’[৪]

আরো দেখলাম কুরআনের এই আয়াতঃ
‘তোমরা আল্লাহর নিয়ামাত স্মরণ করো; যখন তোমরা শক্র ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে প্রতিসঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।’[৫]

এবং আমার জন্য আরো অপেক্ষা করছিল
কুরআনের এই আয়াত-ও, ‘নিশ্যহ মুমিনরা
পরস্পর ভাই-ভাই।’[৬]

আমি তখনই মুমিন যখন আমি আমার আরেক বোনকে নিজের বোন মনে করব। সে আমার ঈমানী দেহের অঙ্গ। এটা আমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি নিয়ামাত। কিভাবে এটা সন্তুষ্য যে, আমি নিজেকে একজন প্রকৃত মুসলিম দাবি করবো অর্থচ আমার আচরণে ইসলাম পুরোপুরি প্রকাশ পায় না।

যে ভাতৃত্ব সোনালি ঘুগের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মধ্যে ছিল, তা যদি আমাদের মাঝে থাকত, তাহলে আমাদের সম্পর্কগুলো কত মজবুত হতো! কত তুচ্ছ কারণে আজ আমরা একে অপরের শক্র হয়ে যাই।

মাথার ভেতর একটা ভাবনাই বারবার ঘূরছ।
কে প্রকৃত অপরাধী? আমি নাকি সেই
মেঘেটি?[৮]

রেফারেন্সঃ

১. সীরাতে ইবনে হিশাম ২/১০৬
(ইসলামী ফাউন্ডেশন)
২. সহীহ বুখারী (৩৫৭০)
৩. সহীহ বুখারী (২৩২৫)
৪. সহীহ মুসলিম (২৫৮৬)
৫. সুরা আলি ইমরান(৩ : ১০৩)
৬. সুরা আল-হজুরাত (৪৯ : ১০)
৭. সত্য ঘটনা অবলম্বন।

হৃদয়ে

ধারণ করো!

-শাহনাজ খুমী
বনম শ্রেণি

কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা নাযিল হয়েছে তোমার-আমার-এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীর বাইরে যা কিছু আছে তার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে। কুরআনের সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনা করা যায় না। কুরআনের সুর শোনা শুরু করলে শুনতেই ইচ্ছে হবে, বিরক্তি আসবে না, যদি-না অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত থাকে। এর তি঳াওয়াতে প্রতি হরফে ১০ নেকি। আল্লাহ চাইলে আরও বাড়িয়েও দিতে পারেন।

তোমার রবের পক্ষ থেকে আসা বাণী তুমি উচ্চারণ করছো। ব্যাপারটা একটু গভীরভাবে অনুভব করো।

আচ্ছা, ভেবে দেখেছো কি- একটি আয়াত হিফয করতে হলে তোমার কমপক্ষে কত বার আয়াতটি পড়তে হবে? নিশ্চয়ই ৮-১০ বার। অথবা এরচেয়েও বেশি।

যদি একটি আয়াত ৮ বার পড়ো এবং আয়াতটিতে ১৫টি হরফ থাকে আর প্রতি হরফের নেকি হয় ১০ গুণ বেশি, $8 \times 15 \times 10 = 1200$ নেকি! সুবহানআল্লাহ! ইচ্ছে করে না হাজার হাজার নেকি পেতে?

ব্যাপারটা এমন না যে, পুরো ৩০ পারা হিফয করতে না পাড়লে হিফযের কাজে নামাই যাবে না। বরং উচিত হলো তুমি যে বয়সের-ই হও এবং যেই পেশায় নিয়োজিত থাকো, কুরআন হিফযের চেষ্টাকে অব্যাহত রাখা। আল্লাহ চাইলে অবশ্যই একদিন না একদিন সম্পূর্ণ কুরআন তোমার হৃদয়ে থাকবে।

প্রতিদিন ১টি আয়াত হিফয করলেও ১ মাসে ৩০ টি আয়াত! ৩০টি আয়াত কি কম মনে হচ্ছে? একটি হাদিস শুনাই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'কিয়ামাতের দিন কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পড়ো এবং উপরে উঠতে থাকো। যেভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সাথে পড়তে সেভাবে পড়ো। যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে জাগ্নাতের সেই সুউচ্চ স্থানেই তোমার বাসস্থান।' [১] অর্থাৎ, এই ৩০ আয়াত মুখ্য থাকার কারণে তুমি অন্যদের চেয়ে ৩০ স্তর উপরে থাকবে।

আর এভাবে যদি সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করে ফেলতে পারো, এর প্রতিদান অবশ্যই আল্লাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন।

আরেকটি হাদিস শুনাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে ও কুরআন হিফয করবে এবং এর ঘাবতীয় হালাল বিষয়গুলোকে হালাল ও হারাম বিষয়সমূহকে হারাম মনে করবে আল্লাহ তাকে জাগ্নাতে প্রবেশ করাবেন। শুধু তাই নয়, তার পরিবারস্থ এমন দশ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল হবে যারা জাহানামে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল।’[২]

ইচ্ছে হয় না হৃদয়ে কুরআন ধারণ করতে?

তবে হ্যাঁ, শুধু হিফয করতে থাকলেই হবে না, এমনটা যেন না হয়, নতুন আয়াত হিফয করছো আর আগের আয়াতগুলো ভুলে যাচ্ছ। হিফয করার পূর্বে অবশ্যই তাজবীদ সহীহ করে নিবে।

মাঝপথে তোমাকে বাঁধা দিতে কিন্তু তোমার চরম শক্তি (শয়তান) হাজির হবে বিভিন্ন অজুহাত নিয়ে। সব অজুহাত পিছনে ফেলে তোমাকে হিফয়ের কাজ চালিয়ে নিতে হবে। ক্লাসের পড়া যেহেতু তুমি মুখ্য করে ফেলতে পারো, তাহলে কুরআন-ও পারবে। কুরআন নাযিলের পর সাহাবীরা কিন্তু প্রথমে তা মুখ্য করার জন্য বারবার পড়তেন। তুমিও চেষ্টা অব্যাহত রাখো। অতঃপর হৃদয়ে ধারণ করো তোমার রবের বাণী।

রেফারেন্স:

১. সুনান তিরমিয়ী (১৯৪১),
সুনানু আবী দাউদ (১৪৬৪),
মুসনাদ আহমাদ (৬৭৯৯),
সহীহ ইবন খিলান (৭৬৬)।
২. সুনান তিরমিয়ী (১৯০৫),
সুনান ইবন মাজাহ (১১৬), বর্ণনাটি দুর্লিপি।

ବୁଲ୍ ହଲ୍ ଫୁଲ୍ ହଯୋ

- ଓମର ଇବାନ ମାଦିକ

ଗୁଣେ ଗୁଣେ ପଞ୍ଚଶତି ରାତ ପାର ହୟେ ଗେଲ । ପ୍ରିୟ ମାନୁଷଟା ଏଖନେ ତାଁର ସାଥେ କଥା ବଲଛେନ ନା । ତିନି ସଖନ ସାଲାତେ ଦାଁଡାନ, ଉନି ତଥନ ତାଁର ଦିକେ ଏକଟୁ ତାକାନ । ତିନି ଆବାର ସାଲାମ ଫେରାଲେ, ଉନି ଚୋଖ ସୁରିଯେ ନେନ । ଚୁପିସାରେ, ଆନ୍ତେ ଆନ୍ତେ ଛୋଟୁ ଶିଶୁର ମତୋ ନୀରବ ଚାହନି ଦିଯେ ତିନି ତାକିଯେ ଥାକତେନ ଏହି ଆଶାୟ- ଏହି ବୁଝି ଉନି ତାକାଲେନ ଆମାର ଦିକେ । ଉନାର ମଜଲିସଗୁଲୋତେ ଆଗେ ଆଗେ ସାଲାମ ଦିତେନ, ଆର ଏକବୁକ ଆଶା ନିଯେ ତାକିଯେ ଥାକତେନ ଉନାର ଏ ପବିତ୍ର ଠୋଟ୍ ଜୋଡ଼ାର ଦିକେ । ଏକଟୁ ଯଦି ନଡ଼େ... ଆମାର ସାଲାମେର ଉତ୍ତରଟା ଯଦି ପାଇ...

ଶୁଧୁ ପ୍ରିୟ ମାନୁଷଟାଇ ନା, ଏକେ ଏକେ ସବ ସଙ୍ଗୀ-ସାଥୀ ଏଭ୍ୟେଡ କରତେ ଶୁରୁ କରଲେନ ତାଁକେ । ହଦୟ ସାଗରେ ଉପଚେ ପଡ଼ା ବ୍ୟଥାର ଟେଉ ନିଯେ ତିନି ଗେଲେନ ଚାଚାତୋ ଭାଇୟେର କାହେ । ମେ ଛିଲ ତାର ଏକଜନ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି । ଯେଯେ ସାଲାମ ଦିଲେନ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପେଲେନ ନା । ତବୁଓ ବୁକେ କ୍ଷୀଣ ଆଶା ନିଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ- ତୋମାକେ ଆଲ୍ଲାହର କସମ ଦିଯେ ବଲଛି ‘ତୁମି କି ବିଶ୍ୱାସ କରୋ ଯେ, ଆମି ଆଲ୍ଲାହ ଏବଂ ତାର ରାସୁଲ ସାଲ୍ଲାହାଲ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ-କେ ଭାଲୋବାସି?’ ମେ ଚୁପ କରେ ରହିଲୋ ।

উনি আবারো তাকে শপথ দিয়ে সে কথা জিজ্ঞেস করলেন। এবারও সে চুপ করে রইল। আবারো শপথ দিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, এবারও সে চুপ করে রইল। চতুর্থবার যখন শপথ দিয়ে সে কথাটি-ই জিজ্ঞেস করলেন, সে উভয়ের বলল, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই ভালো জানেন।’ একথা শুনে উনার চোখ অশ্রুসজল হয়ে এলো। দেয়াল টপকে চলে এলেন তিনি।

রাতের পর রাত কেঁদেই গেছেন তিনি। প্রতিটা রাত জাগায়, কানার প্রতিটা ফোঁটায়, প্রতিটা দীর্ঘশ্বাসে স্বপ্ন দেখেছিলেন নতুন এক ভোরের। যেই ভোরে কোনো কষ্ট থাকবে না। প্রশান্ত হন্দয়ে উনি আবার আমায় বুকে জড়িয়ে নেবেন। উনাকে আবার আমি কবিতা শোনাব। উনি কবিতা শুনে দু'আ করবেন আমার জন্য।

পঞ্চাশতম ভোরে তিনি ফজর সালাত আদায় করলেন। মনে হলো পুরো পৃথিবী কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এই পৃথিবী উনার কাছে চির অচেনা। বিশাল একটি পাহাড়ের উপর থেকে ভেসে এলো এমন কিছু শব্দ, যেগুলো শীতল করে দিলো অন্তরকে। একে কী দ্রেফ শব্দ বলা চলে? পঞ্চাশ রাতের হৃ করা কষ্ট ও কানাকে এক নিমিষেই উড়িয়ে দিলো এই শব্দেরা :

“হে কা'ব ইবনু মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করো।

হে কা'ব ইবনু মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করো।”

বলছিলাম রাসূলুল্লাহর ﷺ আনসার এবং কবি সাহাবী কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহৃর কথা। নিজের সামান্য ভুলের কারণে তাবুক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি (তাঁর সাথে আরো দুইজন সাহাবী ছিলেন, যাঁদেরও একই ভুল ছিলো)। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফিরলেন এবং তাঁদের ওয়র শুনলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে মুসলমাদের কথা বলতে নিষেধ করলেন। নিষেধের পঞ্চাশ দিন হয়ে গেল।

পঞ্চাশতম দিনের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী আসে যে কা'বকে এবং তাঁর মতো অন্য দুই সাহাবীকেও ক্ষমা করেছেন। এই সংবাদ শোনার পর তিনি দৌঁড়ে ছুটে গেলেন প্রিয় নবীজির ﷺ কাছে। খুশীতে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও সুন্দর হয়ে উঠেছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ চেহারা। এরপর বললেন - “সুসংবাদ নাও জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনের, হে কা'ব।”[২]

কী এমন জিনিস আছে, যার জন্য স্বয়ং
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা
কুরআনের আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে
তাঁদের ক্ষমা নিশ্চিত করেছেন? চিন্তা
করো, যুক্তে না যাওয়ার মতো ভয়াবহ
অপরাধের পরেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া
তায়ালা আজ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট!
কিয়ামাত পর্যন্ত মানুষের তিলাওয়াতে
ভেসে উঠবে উনাদের কথা! কী এমন
কারণে হয়েছে, বলো তো!

তাওবাহ। মুমিনের এমন একটি
হাতিয়ার যেটা দিয়ে সে শয়তানের
কোমর ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারে।
ঠুনকো এই দুনিয়ার আমরা কেউ
পাফেন্ট নই। দুনিয়ার মোহে পড়ে
আমরা ভুল করেই ফেলি। ভুল
হওয়াটাই আমাদের ফিতরাত।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘প্রত্যেক আদম
সন্তানই পাপ করে, পাপীদের মধ্যে
তারাই সর্বোত্তম যারা তাওবাহ
করে।’[২]

অর্থাৎ, গুনাহ কম-বেশি সবার দ্বারাই
হয়। কিন্তু গুনাহগারদের মধ্যে
তওবাকারীরাই সবচেয়ে উত্তম।

গুনাহকে আঁকড়ে ধরা যাবে না,
কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যে
আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে
নিবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়।
আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ
করে উঠাবো।’[৩]

একের পর এক নিয়ামাত ছিনিয়ে নেয়া
হবে তার কাছে থেকে। সবশেষে অন্তর
হয়ে উঠবে কঠিন। আর যারা গুনাহ
হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিশুন্দ
করে ফেলে তাওবার পবিত্র ঝর্ণায়,
আল্লাহ তো তাদের ভালোবাসে আরও
কাছে টেনে নেন। তাদের শামিল করে
নেন নিজের প্রিয় বান্দাদের মধ্যে।
‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন
যারা তাঁর কাছে বারবার তাওবাহ করে,
এবং ভালোবাসেন তাদেরকে যারা বেশি
বেশি পাক-পবিত্র থাকে।’[৪]

গুনাহে জর্জরিত অন্তর জানতেও পারে
না আল্লাহ তাকে কতটা ভালোবাসেন।
আল্লাহ নিজের অশেষ অনুগ্রহে তাকে
দান করেন ক্লিবুন সালীম। যেই ক্লিবে
ব্যাথা জমে না, যেই ক্লিবে কান্না ঝরে
মুক্তি হয়ে।

ভাই আমার, গুনাহ হয়ে গেলে তাই
বিলম্ব কোরো না। সাথে সাথেই তাওবাহ
করো। তাওবাহ’র বৃষ্টিতে ধূয়ে ফেলো
হৃদয়ের সমস্ত পক্ষিলতা। প্রস্তুত করো
এক ক্লিবুন সালীম, যেই ক্লিবুন
সালীমের পুরস্কার সুবিশাল এক
জান্মাত।

রেফারেন্স:

১. সহীহ বুখারী (৪৪১৮)
২. সুনানে তিরমিয়ী (২৪৯৯), মুসাঘাফে ইবনে আবী শাইবা (৩৫৩৫৭),
সুনানে দারিমী (২৭৬৯), মুসতাদরাকে হাকিম (৭৬১৭)।
৩. সূরা তহার, ২০ : ১২৪।
৪. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২২২।

খুলি মেঘের ডাঁজ

(তৃতীয় পর্ব)

ওমর আলী আশরাফ

ছেলের সঙ্গে আমাদের দেখে কল্লোল
দাশের মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।
তাড়াভড়ো করে টেবিল মুছেন, চেয়ার
আনেন; এই চেয়ার ঠেলে আরেকটা
এনে দেন।

তত্ত্ব মহিলা ব্যস্ত হাতে সব গুচ্ছিয়ে দিয়ে
আমাদের বললেন, ‘আপনারা বসুন,
কল্লোলের সঙ্গে কথা বলুন, আমি
আসছি।’

কল্লোল বলল, ‘মা, উনারা ঢাকা থেকে
আমাদের পাশের মাসজিদে এসেছেন।’

তত্ত্ব মহিলা বললেন, ‘হ্যাঁ, জানি।

উনারা নাকি তাবলীগে এসেছেন, খুবই
ভালো। তুই উনাদের সঙ্গে কথা বল,
আমি আসছি।’

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা ফিরে এলেন।
হাতে দাও, নারকোল, কোরানি আর
বাটি। এসে হাসি দিয়ে বললেন,
‘রান্নাঘরে হলে আপনাদের কথা শুনতে
পারব না। আমি এখানে বসেই কাজ
করি, আপনারা কথা বলুন। আমার
ছেলের অনেক প্রশ্ন আছে, আপনারা
উত্তর দিতে পারবেন। আমিও শুনতে
চাই।’

নিজেদের আঞ্চলিক ভাষার মিশেলে
কথাগুলো বলে মহিলা গেগে গেলেন
নারকোলের ঘাড়ে মাথায় দাও চালানোর
কাজে। তার শক্ত খোলস ভেঙে তুলে
আনবেন টলটলে জল আর তুলতুলে
হৎপিণ—নারকোলের অতি সুস্বাদু শাঁস।

মহিলার আচরণে আমি চমৎকৃত হলাম।
আমাদের দেশে পুরুষদের তুলনায়
সাধারণত মহিলারা ধর্ম নিয়ে বেশি
সেঙ্গেটিভ হয়ে থাকেন। আমরা ঢাকা
থেকে এসে তাদের গ্রামের মানুষকে
ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, হিন্দুদেরকে
তাদের ধর্মের বাতুলতা তুলে ধরে
আল্লাহর আহ্বান শোনাচ্ছি, খ্রিষ্টান
মিশনারিদেরকে আলোচনার জন্য
ডাকছি, যেন প্রতারণার ধর্মান্তরকরণ
বন্ধ করতে বাধ্য হয়, তার ছেলেকেও
ইসলামের কথা বলতে বলতেই
একেবারে তাদের বাড়ি এসে উঠেছি,
এটা বুঝেও মহিলা আমাদের প্রশংসা
গাইছেন! আমাদের কথা শুনতে পারার
জন্য কাছে এসে বসেছেন। এর মানে
সোজা, আমরা এখন যে ক্ষেতে বীজ
বপন করতে নেমেছি, এ জমি বড়ই
উর্বর। লাঙ্গলের ফলার একটু আঁচড়
পেলেই তাতে হয়ত ফলবে ঈমানের
ফসল।

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। সে কি
তুমুল বর্ণ! আজই যেন তিঙ্গা নদী
ভেসে যাবে হৈ হৈ অথৈ জলে। আমরা

গায়ে পড়া বৃষ্টির ফেঁটা ঝাড়া দিয়ে
চেয়ারে বসলাম। ক঳্লোলের তর সইছে
না। বসতে বসতেই সে বলল, ‘উমর
রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা বলছিলেন,
বলুন, আমার অনেককিছু জানার
আছে।’

আমি ক঳্লোলের চোখে তাকালাম। নবম
শ্রেণি পড়ল মাত্র। কত হবে বয়স,
পনেরো! সর্বোচ্চ হয়তো ঘোলো?

ধরি ঘোলো। ঠিক এই বয়সে ইসলাম
গ্রহণ করা একজন বিখ্যাত সাহাবি
ছিলেন। তারি সুন্দর নাম। যুবাইর
ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু।
আমাদের ক঳্লোল দাশের মতো যখন
তার বয়স ঘোলো, ঠিক সেই বালক
বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]
একারণে তার চাচা তাকে প্রচণ্ড শাস্তি
দিত। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে
যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচা তাকে
চাটাইয়ে পেঁচিয়ে উল্টো করে ঝুলিয়ে
আগুনের ধোয়া দিত। আর বলত,
কাফের হয়ে যাও। উত্তরে যুবাইর
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন- আমি
কখনও কুফরি করব না।'[২]

কল্পে ‘ঘোলো’-দের গর্ব যুবাইর
রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা খারাপ হয়ে
যেত। যে বয়সটা খেলাধুলার, ঘোড়ায়
চড়ে বেড়ানোর, তরবারি চালনায়
প্রতিযোগিতা করবার, সেই সময়ে তিনি
কেবল ইসলাম গ্রহণের কারণে

মার খাচ্ছেন, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে না? সেই কিশোর বয়সেই তিনি কঠিন শাস্তির জবাবে বলতেন, ‘কখনোই আমি কুফরে ফিরে যাব না।’ এমনকি শেষমেশ ইসলামের উপর যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবিচলতা দেখে তাঁর চাচা পরাজিত হয়ে তার অবস্থায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।[৩] অথচ আমরা বাবা-মায়ের বকুনি খেয়েও নামায পড়তে চাই না, কুরআন শুন্দি করে পড়তে চাই না, আলিমদের আলোচনায় গিয়ে বসি না। অথচ যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঠিক এ বয়সটা থেকেই রাসূলের সাহচর্যে থাকতে শুরু করেন। যুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর কত বীরত্ব! নবীজির পাশে থাকেন। কাফিরদের তাড়া করেন। গোপন সংবাদ নিয়ে আসেন। তাঁর ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, ‘প্রত্যেক নবীর একান্ত সহচর ছিল, আমার একান্ত সহচর হলো যুবাইর।’[৪] পরবর্তীতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ধারিত ছয় শূরা সদস্যের একজন ছিলেন তিনি।[৫]

যোগো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে ত্যাগ সহ্য করা এই সাহাবীর অনেক বীরত্ব আর কৃতিত্বের গল্প হাদিসের কিতাবাদিতে আছে। কিন্তু তিনি বিখ্যাত আরও একটি কারণে, যে গৌরব আর কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। ইসলামের জন্য প্রথম তরবারি কোষমুক্ত

করেছিলেন তিনি—আমাদের ‘যোগো’দের গর্ব, হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু।[৬] দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যাওয়া দশজন সাহাবির একজন তিনি।[৭] তিনিও যোগো ছিলেন, আমরাও যোগো, কত ব্যবধান তাঁর আর আমাদের মধ্যে!

আমি কল্লোলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম, যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির ফুফাতো ভাই ছিলেন; বিখ্যাত সাহাবিয়্যাহ সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার ছেলে।[৮] তারপরও ইসলাম গ্রহণের কারণে চাচার হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। আমাদের কল্লোল দাশ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তার এই ভালো মনের মা-টিই আবার হিংস্র হয়ে উঠবে না তো!

(চলবে, ইনশাআল্লাহ)

রেফারেন্স:

১. ভিন্ন বর্ণনায় আছে, মাত্র আট বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, শাস্তি ও সেই সময়েই হয়েছিল।[২]
২. আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী(১/১২২), হিলয়াতুল আউলিয়া(১/৮৯), আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৫৫৪৭)
৩. আল-ইলাল লিল ইমাম আহমাদ-(১/১৬৭), সিয়ারত্স সালাফ-(১৮/৩৪৯)
৪. সহীহ বুখারী (২৮৪৭)

৫. সিয়ারত্স আ'লামিন নুবালা; যাহাবী ১/৪১
৬. মারিফাতুস সাহাবা; আবু নুআইম ইস্পাহানী ১/১০৩ (৪০৫), আল ইসতাআ'ব ফী মারিফাতিল আসহাব; ইবনু আব্দিল বার ২/৯০, তারীখে দিমাশক; ইবনে আসাকির ১৮/৩৫০
৭. সুনানে তিরমিয়ী (৩৭৪৭), মুসাল্লাফে ইবনে আবী শাইবা (৩২৬০৯), মুসনাদে আহমাদ (১৬২৯), সহীহ ইবনে হিবান (৭০০২)
৮. আত তারীখুল কাবীর; বুখারী ৩/৪০৯ (১৩৫৯)

মহানবীর মহানুভবতা (প্রথম পর্ব)

আঘি ফে নবীজি

বৈরে ও ক্ষমার বিরল দৃষ্টিক্ষণ

মুহাম্মদ কাউছার হামীদ

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার প্রিয় নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করেন,

“হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জীবনে কি এমন কোনো দিন এসেছে যা উভদের দিনের চেয়ে কঠিন ছিল?”

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“হ্যাঁ (এসেছে) তোমার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে আমাকে যে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ছিল ঐ দিনটি, যে দিন আমি ঘাঁটিতে বিচলিত ছিলাম, যখন আমি নিজেকে আবদে ইয়ালীল বিন আবদে কুলালের পুত্রদের নিকট দাওয়াত পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করায় দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে চলতে থাকি। চলতে চলতে ‘কারনুস সাআলিবে’ পৌঁছি হাঁফ ছাড়ি।” [১]

প্রিয় বন্ধুরা,

এই ঘটনাটি ঘটেছিল তায়িফে। এটি নবীজির জীবনের কেমন দুঃখজনক ঘটনা ছিল এবং কী কী ঘটেছিল- চলো পড়ে দেখি এবং প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করি।

নবীজি তায়িফে এলেন। উদ্দেশ্য- কালিমার দাওয়াত দেয়া। যাতে দাওয়াত করুল করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করে তায়িফবাসী।

সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন। তায়েফ এলাকায় 'সাক্ফীফ' গোত্রের তিনি নেতার কাছে তিনি দাওয়াত নিয়ে গেলেন। যারা ছিলো পরস্পর ভাই। নবীজি তাদের নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। বললেন ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে।

হতভাগ্য ভাতাত্রয় নবীজির কথা মানল না। তারা ইসলামের দাওয়াত করুল করল-ই না। উপরন্তু নবীজিকে এমন সব কথা বলল, যা ছিলো—

- অত্যন্ত কষ্টদায়ক
- অপমানজনক এবং
- হৃদয়বিদারক।

ভাইগ্রনের প্রথমজন বলল—

“সে কাবার পর্দা ফেড়ে দেখোক, যদি আল্লাহ তাকে রাসূল করে থাকেন।”

দ্বিতীয়জন বললো—

“নবী করার জন্য আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাননি?” (নাউযুবিল্লাহ)

এই কথাটা যে কত অপমানজনক মনে মনে চিন্তা করলে হয়ত কিঞ্চিৎ উপলক্ষ্মি করতে পারবে। ধরো তুমি কোথাও দাওয়াহ’র কাজে গেলে। একজনকে দাওয়াহ দিলে। সে মুখ বরাবর বলে দিলো—

মিয়া তুমি এসেছ দাওয়াত দিতে? তুমি ছাড়া এ কাজের আর কি মানুষ নেই? তখন কেমন লাগবে তোমার ভেবে দেখো তো!

তৃতীয়জন বললো—

“তোমার সঙ্গে আমি কথাই বলব না। কেননা প্রকৃতই যদি তুমি নবী হও তবে তোমার কথা প্রত্যাখান করা আমার জন্য বিপজ্জনক। আর তুমি যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচারে লিঙ্গ হও তবে তো তোমার সঙ্গে কথা বলা সমীচীন নয়।”

তাদের এমন ‘অপমানজনক’ বাক্যে বিষণ্ণ মন নিয়ে ফিরে এলেন নবীজি। তাদের থেকে কল্যাণের বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেলেন। তিনি যখন দেখলেন, তারা কিছুতেওই ঈমান আনবে না। তখন সেখান থেকে চলে আসার মনস্ত করলেন। প্রস্থানকালে তিনি বিনয়ের সাথে শুধু বললেন,

“তোমরা যা করলে ও বললে তা গোপন রেখো। অন্যদের জানিও না।”

কিন্তু হতভাগ্য ভাতাত্রয় নবীজির এ কথাটিও রাখেনি। তারা শহরের শিশু-কিশোর ও যুবকদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। এসব শিশু-কিশোররা হাত তালি দিয়ে অশ্রাব্য-অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করতে লাগল। শুধু তাই নয়, তারা নবীজির দিকে অবিরাম পাথরবর্ষণ করতে লাগলো।

পাথরবর্ষণ চলতেই থাকল। ফলে রক্তে রঞ্জিত হলো মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, রহমাতুল্লিল আল-আমিন। প্রৌঢ় বয়সের সেই লোকটি, যিনি এক সময় আরবের খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন। কালিমার দাওয়াত দেয়ার কারণে তিনি এখন অনেকের নিকটেই চক্ষুশূল! তিনিই তো ছিলেন আল-আমিন; আমাদের প্রিয় নবীজি,

আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ ﷺ ।

আশ্চর্য! তায়িফবাসী এই যে নবীজি-কে এত অপমান ও অপদষ্ট করলো, দুঃখ দিল, শেষে রক্ত পর্যন্ত ঝরালো; তার বিপরীতে রাসূল কী করলেন? কী বললেন?

রাসূলের সফরসঙ্গী যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বললেন,
“হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদের জন্য বদ দুআ করুন।”
কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তা করেছিলেন?
করেননি!

পাহাড়-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশতা এসে রাসূলকে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি
যদি চান তবে এদেরকে আমি দু'পাহাড় একত্রিত করে পিঘে ফেলি, তবে তাই
হবে।”

কিন্তু দয়া ও মায়ার পরাকাষ্ঠা যিনি, তিনি কি তার অনুমতি দিয়েছিলেন? দেননি! [২]

বরং তিনি তায়িফবাসীর জন্য বলেছিলেন,
“আমি ওদের বিরুদ্ধে কেন বদদু'আ করবো? ওরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান নাও
আনে, তবে আশা করা যায়, তাদের পরবর্তী বংশধর অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর
ইবাদাত করবে।”

সুবহান আল্লাহ! একটু ভাবো প্রিয় বন্ধুরা, নবীজি কেমন গুণে গুণান্বিত ছিলেন।
কেমন ছিল তাঁর আখলাক।

কেমন মহানুভব হলে একজন মানুষ এমন ধৈর্য ও ক্ষমার পরিচয় দিতে পারেন।
সত্যিই তাঁর এই ক্ষমার দৃষ্টান্ত মানব-ইতিহাসে বিরল।[৩]

শিক্ষা:

এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি? শিক্ষা নিতে পারি—

- মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার।
- দ্বীনের পথে আসা সকল বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করার।
- মানুষের কল্যাণ কামনা করার।
- ক্ষমা করে দেয়ার।

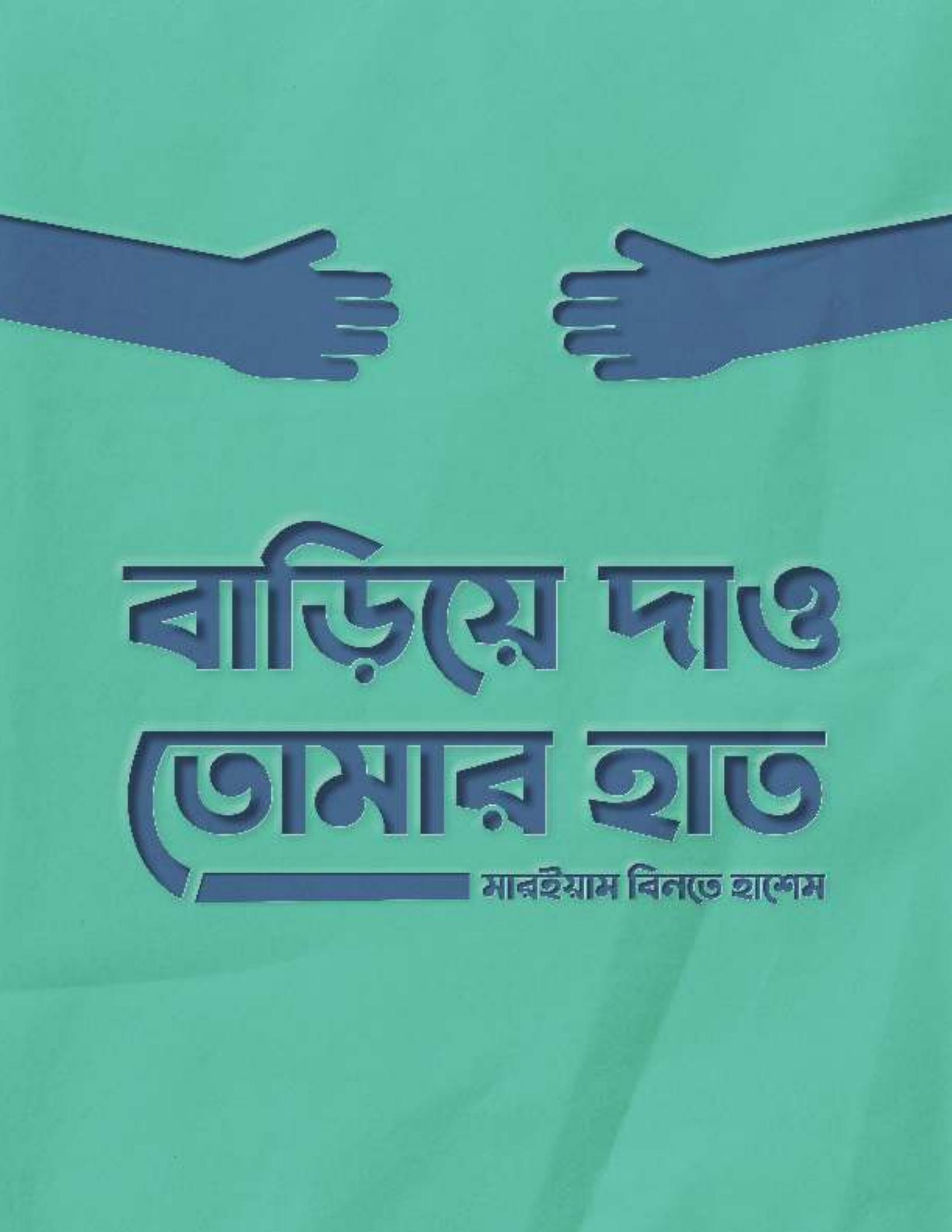
প্রিয় বন্ধুরা,

চলো আমরাও প্রতিজ্ঞা করি, আজ থেকেই দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করব। দাওয়াত দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি বিজ্ঞজন থেকে শিখে বিনয়ের সাথে দাওয়াত দিবো। নিজেকেও এই মহান কাজে নিয়োজিত করব। নিজেরা নামায পড়ব। তাদেরও নামায পড়তে বলব। এর ফলে তারা যদি কোনো কটু কথা বলে অথবা অশোভন আচরণ করে, তবে ধৈর্য ধারণ করব। ক্ষমা করে দিব। ঝগড়ায় লিঙ্গ হব না। বরং আল্লাহর কাছে তাদের হিদায়াতের জন্য দু'আ করব।

আল্লাহ আমাদের দ্বীনের পথে আটল ও অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন।
আমিন।

তথ্যসূত্র:

১. সহীহ বুখারী (৩২৩১), সহীহ মুসলিম (১৭৯১)
২. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪১৯-৪২০
৩. ৮ম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ অবরোধ করেন। অবরোধ ও যুদ্ধ শেষে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধেই মুসলিমরা ব্যবহার করেন মিনজানিক নামক হাত কামান। (আর-রাহিকুল মাখতুম -৮৭৮-৮৮০, তাওহীদ পাবলিকেশন)



বাড়িয়ে দাও তোমার হাত

মারহিয়াম বিনতে আশেম

মসজিদ প্রীতি আমার বরাবরই তীব্র। মসজিদ বারান্দা থেকে সরাসরি তাকালেই সবচেয়ে কাছের মসজিদটা দেখা যায়। এক জুমু'আর কথা। হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখলাম জুমু'আর সালাতের জামাআত শুরু হচ্ছে।

'আল্লাহ আকবার' তাকবীরের মাধ্যমে আর-রহমানের বান্দাদের সারিবদ্ধভাবে সালাতে দাঁড়নোর দৃশ্য দেখা মাত্রই অন্তরে অন্যরকম এক প্রশান্তি অনুভব করলাম। সাথে সাথেই চোখ থেকে আনন্দশূল গড়িয়ে পড়লো। পরক্ষণেই কানে আসলো ইমাম সাহেবের মনোমুন্ধকর তিলাওয়াত। এক অদ্ভুত অনুভূতি।

এ মুহূর্তে শুধু একটা ব্যাপারই হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো, “এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য হয়ত দুনিয়াতে আর কিছু হয়না—যেখানে ধনী-গরীব, ছেট-বড়, সাদা-কালো কারো কোনো ভেদাভেদ নেই। যেখানে সবাই বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের কাছে নিজেকে সবচেয়ে তুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন করছে। মাথা নত করে সিজদায় লুটিয়ে মহান রঞ্জুল আলামীন-এর বড়ত্ব আর নিজের ক্ষুদ্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে।”

নামায়ের এই কাতারে ফুটে উঠছে একতার এক নির্দশন। এবার বিপরীত একটা পরিবেশ লক্ষ করো।

ধরো, তোমার পরিবার অথবা তোমার খুব কাছের মানুষ যার সাথে তোমার খুব আন্তরিক সম্পর্ক। হঠাৎ কোনো একদিন তুচ্ছ কোনো কারণে মনোমালিন্য হলো। অতঃপর সম্পর্কচ্ছেদ হবার উপক্রম! এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছো কখনো?

দৈনন্দিন জীবনে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন বা

পথেঘাটে পরিচিত-অপরিচিত অনেকের সাথেই অনেক সময় কথা কাটাকাটি হয় আমাদের। কিছুক্ষেত্রে তা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে গুরুতর পর্যায়ে চলে যায়। কিছু মানুষ আবার তা বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করে। হয় আগুনে পর্যায়ক্রমে ঘি ঢালে, নয়ত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আরেক দল মানুষ তৎক্ষণাত তাদের মধ্যকার সমস্যা নিরসনের প্রচেষ্টা চালায়, সমরোতার ভিত গড়ে দেয়। এবার চলো, দুজন ব্যক্তি বা দলের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হলে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ দেখে আসি।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তাআলা
বলেন,

“নিশ্চয়ই মুমিনরা পরম্পর ভাই ভাই।
কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে
আপস মীমাংসা করে দাও।” [১]

সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আন্ন থেকে
বর্ণিত,

“কুবা’র অধিবাসীদের মধ্যে লড়াই বেঁধে
গেল। এমনকি তারা পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু
করল। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খবর দেয়া হলে
তিনি বললেন, ‘চলো যাই, তাদের মধ্যে
মীমাংসা করে দিই।’” [২]

একটা কথা আমরা সবাই জানি যে, মিথ্যা বলা জঘন্যতম এবং নিন্দনীয় পাপ। কিন্তু আমরা কি এটা জানি যে, তিনটি ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে কিঞ্চিং মিথ্যা বলা জায়েজ আছে? যার একটি ক্ষেত্র হচ্ছে, দুজন ব্যক্তি বা দলের পারম্পরিক বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার সময়।

জায়েজ মিথ্যা! হ্যাঁ। তুমি ঠিকই পড়েছো।

চলো দেখে আসি এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন।

উম্মু কুলসুম বিনতু উকবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত- তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

“সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য ভালো কথা পৌঁছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে।” [৩]

অর্থাৎ যখন দু'জন ব্যক্তি বা দল পরস্পরের মাঝে দ্বন্দ্বে লিঙ্গ হবে, আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করব তাদের মধ্যে আপস করে দেয়ার। কারণ ঐ সময়ে একে অন্যের প্রতি ক্ষুব্ধ থাকে। এজন্য যদি এক পক্ষের ব্যাপারে অপর পক্ষকে ভালো কিছু বলা হয়, যা শুনলে তারা খুশী হয়ে মিটমাট করতে এগিয়ে আসবে তখন প্রয়োজনে সেটাও করা উচিত যদি তাতে যৎসামান্য মিথ্যাও থেকে থাকে।

একটু চিন্তা করে দেখো, আল্লাহু সুবহানাল্লাহু ওয়া তাআলার নিকট হালাল সম্পর্কের গুরুত্ব কতটা উর্ধ্বে হলে তিনি সম্পর্কের দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য প্রয়োজনে মিথ্যা বলারও অনুমতি দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! এমনটা তুমি কোথায় পাবে ইসলাম ছাড়া?

এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

আমি কি তোমাদের মর্যাদার দিক থেকে সিয়াম, সালাত, সদাকাহুর চেয়েও ফয়লিত পূর্ণ কাজের কথা বলবো না? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই হে আল্লাহুর রাসূল! তিনি বললেনঃ পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করা। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধানো ধর্ষনের কারণ। [৪]

ইসলাম আত্মকেন্দ্রিক হয়ে প্রতি মুহূর্ত

নিজেকে নিয়ে ভাবতে শেখায় না। ইসলাম শেখায় কী করে এক মুসলিম হিসেবে অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে ভালোবাসার, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা যায়। অন্যের বিপদে প্রাচীরের ন্যায় পাশে থাকা যায়।

খাবার খাওয়ার সময় কখনো ভেবেছো, তোমার প্রতিবেশি খেয়েছে কি না? তুমি নিজে খাবে অথচ প্রতিবেশি অনাহারে দিন কাটাবে এটা ইসলাম সমর্থন করে না। অনেকেই আছে যারা বিপদে পড়লে, অনাহারে থাকলেও চক্ষুলজ্জার কারণে তা প্রকাশ করে না। তখন কী করে জানা যাবে তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে? প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর রাখার মাধ্যমে।

এ সম্পর্কিত হাদিসটি পড়ি চলো।

ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“সে প্রকৃত মুমিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার প্রতিবেশি অনাহারে থাকে।” [৫]

মুমিন হবার জন্য শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, অন্যদের নিয়েও ভাবতে হয়। ইসলাম শেখায় কী করে পবিত্র সম্পর্কের সুন্দরতম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। ইসলাম প্রতারণার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়না। নিজের আর ভাইয়ের জন্য একই মানের জিনিস পছন্দ করার নির্দেশ ইসলাম-ই তোমাকে দিচ্ছে।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।” [৬]

আমরা কাউকে কিছু দিলে বা সাজেস্ট করলে অনুত্তম জিনিস পরিহার করে সেটাই পছন্দ করবো, যেটা নিজের জন্যেও করতাম।

আচ্ছা তুমি কি কখনো তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, রিকশাওয়ালা চাচা, গৃহকর্মী, স্কুলের দারোয়ান অথবা রাস্তায় চলা সম্পূর্ণ অপরিচিত কাউকে প্রথমে সালাম দিয়েছো? তিক্ত হলেও সত্য, আজকাল সালাম আদান-প্রদান যতটা না শিষ্টাচার কেন্দ্রিক; তারচেয়েও বেশি আতঙ্ক কেন্দ্রিক। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সালামের নামে তথাকথিত সিনিয়র কর্তৃক জুনিয়র বা নবাগতদের উপর যেভাবে নির্যাতন চালানো হয়, এটাই কি সালামের প্রকৃত উদ্দেশ্য? অথচ আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবীজি, সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষটি কিনা শিশুদেরকেও আগে সালাম দিতেন। এ সম্পর্কিত হাদিসটি দেখো।

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার একদল শিশুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের সালাম দিয়ে বললেন যে, “নবি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তা করতেন।”^[৭]

‘আস-সালাম’ আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম। সালামের মাধ্যমে একে অন্যের জন্য শান্তির দুআ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, পরম্পরের প্রতি সম্মানের সৃষ্টি, ভালোবাসা বৃদ্ধি ও ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। আবার যারা কম-বেশি সালাম দেয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা পরিচিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম না দেয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তর আসে—সংকোচবোধহয়, লজ্জা লাগে, কী মনে করবে!

রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কী বলেছেন জানো?

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত- জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজেস করল,

“ইসলামে কোন জিনিসটি উত্তম?”

রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন,

“তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দিবে।” [৮]

ইসলামের উত্তম আদবটি আঁকড়ে ধরার জন্য কিছুটা সংকোচ, লজ্জা ত্যাগ করতে পারবো তো আমরা ?

ইসলাম শুধু নামমাত্র জীবনব্যবস্থা নয়। আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্঵ীন হচ্ছে ইসলাম। এর সম্পর্কে যত গভীরভাবে জানবে, ভাববে; এর সৌন্দর্যে তত বেশী মুক্ষ হবে, ভালোবাসবে।

এটাই ইসলামী ভাতৃত্বের বন্ধন। এমন সহস্র ভাতৃত্ববোধের উদাহরণ ইসলামের মাঝেই দেখবে। তোমারই কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আল্লাহর জন্য ভালোবেসে মেহের হাতটা বাঢ়িয়ে দিয়ো। তিনি সন্তুষ্ট হলে, ইনশা আল্লাহ দেখা হবে জান্নাতের আঙ্গিনায়।

তথ্যসূত্রঃ

- [১] সূরা আল-হজুরাত, ৪৯ : ১০ (১১২), আল বিরক ওয়াস সিলাহ; হসাইন ইবনে হারব (২৬৪)
- [২] বুখারি (২৬৯৩)
- [৩] বুখারি (২৬৯২)
- [৪] সুনানু আবি দাউদ, (৪৯১৯)
- [৫] আল আদাবুল মুফরাদ; বুখারী [৬] সহীহ বুখারী (১৩), সহীহ মুসলিম (৪৫)
- [৭] বুখারি, (৬২৪৭)
- [৮] বুখারি, (১২)

ফিতৰাত

সহজাত প্ৰবৃত্তি



ওবায়দুল্লাহ বিন শাহেদ
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট

বর্তমানে কমবেশি আমাদের সবারই স্মার্টফোন আছে। এই যুগে স্মার্টফোন নেই এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই স্মার্টফোনগুলোতে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে অ্যান্ড্রয়েড আইওএস অথবা উইন্ডোজ (এখন যদিও উইন্ডোজ একজিস্ট করে না) ইন্সটল করা থাকে। পাশাপাশি আগে থেকেই কিছু অ্যাপ্লিকেশন ইন্সটল করা থাকে, যাদেরকে আমরা বিল্ট ইন অ্যাপ্লিকেশন বলি। এদের অনেকগুলোকে চাইলেই ডিজেবল করে রাখা যায়।

ঠিক তেমনি, একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন ওই অপারেটিং সিস্টেম কিংবা অ্যাপ্লিকেশনস এর মতো তার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য, ইনেট ন্যাচার কিংবা সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করে, যা তাকে একটি পর্যায়ে এক স্রষ্টায় বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে। এই টার্মিনাকে আরবিতে ফিতরাত বলে। ফিতরাত আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ।

যদি শিশুটিকে যেকোনো প্রভাব থেকে দূরে একা রাখা যেত, “কোন সন্তান যখন তাহলে সে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়েই বেড়ে উঠত। কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনস ডিজেবল করার মতো, ফিতরাতকে (যা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি) প্রভাবিত করা যায়, দাবিয়ে রাখা যায় মনের গহীন কোণে। শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যু অবধি তার বাবা-মা, চারপাশের পরিবেশ তাকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“কোন সন্তান যখন জন্ম লাভ করে, তখন স্বভাবধর্মের (ইসলামের) ওপরই জন্ম লাভ করে।”
অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদি বা নাসারা বানায়। যেমন, কোনো চতুর্পদ জন্ম

যখন বাচ্চা প্রদান করে, তখন কি কান কাঁটা দেখতে পাও যতক্ষণ না তোমরা তার কান কেটে দাও?”[১]

গ্রাথমিক বয়সে একটি শিশু তার চারপাশের প্রভাবকের বিপরীতে খুব একটা দাঁড়াতে পারে না। ফলস্বরূপ তার বাপ-দাদার দেখানো পথেই হাঁটা শুরু করে। কিন্তু যখন শিশুটি পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তখন হয় সে পূর্বের বিশ্বাসে স্থির থাকে অথবা বিপথে চলে যায়।

কিন্তু এরপরও যারা নিজেদের ফিতরাত এবং শয়তানের দেখানো পথের মধ্যে ফিতরাতকে গ্রহণ করে আল্লাহ সুবাহানাল্লাহ তাআলা তাদেরকে শয়তানের বিপরীতে, তাদের নফসের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন। যদিও এতে করে তারা তাদের জীবনের শেষ সময়ে উপনীত হয়। মানুষ যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে, চিনতে পারে, বাহুড়োরে গ্রহণ করতে পারে, এজন্য আল্লাহ সুবাহানাল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বহু নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং আমাদের জন্য ফিতরাত অনুযায়ী চলা সহজ করে দিয়েছেন।

কিছু পরীক্ষালক্ষ তথ্য থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়া যায়। গ্যালাপ ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক ৬০টি দেশে চালানো এক জরিপে দেখা যায়, দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ৮৭% মানুষ কোনো না কোনো ধর্ম বিশ্বাসের অধীন।

পিউ ফোরাম অন রিলিজিওন এ্যান্ড পাবলিক লাইফ ফোরাম কর্তৃক ৩৬,০০০ অ্যামেরিকানদের উপর চালানো জরিপের দেখা যায়, ৮৭% সৃষ্টিকর্তার অঙ্গিতে বিশ্বাসী। ৮২% মনে করেন ধর্ম তাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২০% ব্যক্তি যারা নিজেদের নাস্তিক দাবী করে তারাও কোনো না কোনো ফর্মে বিশ্বাস করেন অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে। ৫০% সংশয়বাদী ব্যক্তিদেরও একই উপলব্ধি।[২]

ফিতরাত যে ইন জেনারেল সবার মাঝেই উপস্থিত, তা বুকতে খুব একটা কাঠ-খড় পোড়াতে হবে না। মানুষ যখন হতাশা, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিঃপত্তি হয় তখন ঠিক মনের অজান্তেই দ্রষ্টাকে ডাকতে শুরু করে। এটা মানুষের একটি ইঙ্গিট্যান্ট রিয়্যাকশন বলা যেতে পারে, বিপদের মুহূর্তে অতিথ্রাকৃতিক কিংবা শক্তিশালী সত্ত্বাকে মনে করা এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

আল্লাহ বলেন,

“মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অনুতঙ্গ হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার রবকে ডাকে। কিন্তু পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে তা(সেই কষ্টের কথা) ভুলে যায়, যে জন্য সে ইতিপূর্বে আল্লাহকে ডেকেছিল। আর তখন সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, যার ফলে সে অপরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলো, কুফরীর জীবন তুমি কিছু কাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমি তো জাহানামেরই অধিবাসী।”[৩]

আল্লাহ সুবাহা'নাহু তা'য়ালা কুরআনের অনেক আয়াতে ফিতরাত সম্পর্কে বলেছেন।

“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো—আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্টতা দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বলো আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীগন তো তাঁরই উপর ভরসা করে।”[৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

“মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করলে, সে আমাকে আহবান করে। অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি। তখন সে বলে, আমি তো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে।

বস্তুতঃ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।”[৫]

আরেক আয়াতে আছে,

“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই
বলবে, আল্লাহ! তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?”[৬]

যারা এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে, তাদের উচিত হবে বাপ-দাদার দেখানো পথে না
হেঁটে, সত্যকে গ্রহণ করা। কিন্তু যারা ফিতরাতকে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মুখ ফিরিয়ে নেয়,
তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

“এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো তখন
তারা বলে, বরং আমরা তাই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃপুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি;
যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের কোনো জ্ঞানই ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না।”[৭]

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোনো ভরসা নেই; কোনো ক্ষমতা বা
শক্তি নেই। সকল প্রশংসা এবং সুন্দর নামসমূহ তো কেবল আল্লাহ সুবাহানাল্ল ওয়া
তা'আলার।

আমরা মুসলিম ঘরে জন্মেও ইসলামকে উপলব্ধি করতে পারিনি। দুনিয়ার আরাম আয়েশে
মত্ত হয়ে দ্বীন থেকে দূরে চলে গেছি, নিজের প্রবৃত্তিকেই রব হিসেবে গ্রহণ করছি, আল্লাহ
তা'য়ালা আমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই তো গাফুরুর রহিম। ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

“হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং
আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন।”[৮]

১. বুখারি। (৬৫৯৯)

৫. সূরা আয়-যুমার, আয়াত-৪৯

২. Psychology of Islam

৬. সূরা আয়-যুখরুফ, আয়াত-৮৭

৩. সূরা আয়-যুমার, আয়াত-৮

৭. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত-১৭০

৪. সূরা আয়-যুমার, আয়াত-৩৮

৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮

পিংপড়ার মারিতে আলোর খেঁজে

- যোরমান যোস্বল্লাহ স্নাবিমি

এক হালকা শীতের সকালে মনের আয়েশে পিঠা খাচ্ছিলাম। একটু অস্তর্কর্তায় মনের অজান্তে এক টুকরো পিঠা মাটিতে পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর খেয়াল করলাম, কোথেকে যেন পিংপড়ার দল এসে হাজির।

এটি আমাদের জীবনের সচরাচর ঘটা একটি সাধারণ ঘটনা। কোথাও মিষ্টি জাতীয় কিছু পেলে সেখানে দলবেধে পিংপড়ার আনাগোনা সবাই কমবেশি প্রত্যক্ষ করে থাকি। পিংপড়ার এই দলবেধে থাকার গন্ধ ছাড়াও রয়েছে আরো বেশ কিছু মজার গন্ধ।

পিংপড়া মহান রক্ষুল আল-আমিনের এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি। সারা পৃথিবীতে ২২ হাজারেরও বেশি প্রজাতির পিংপড়া পাওয়া যায়। পিংপড়া চলার সময় ‘ফেরোমেন’ নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে, বাকি পিংপড়ার দল সেটা অনুসরণ করে পথ চলতে থাকে। কোনো পিংপড়া কখনো পথ হারালে নিজের দলকে খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করে। না পেলে নতুন কোনো দলের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে যায়। পিংপড়ার বসবাস অনেকটা কলোনীর মতো; যেখানে অসংখ্য পিংপড়া একসাথে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। এমনকি তারা একে অন্যের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত! এসব পিংপড়া সাধারণত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক কলোনীতে কাটিয়ে দেয়। বলা হয়ে থাকে তাদের এই সমভাবাপন্ন ও সহযোগিতা মনোভাবের জন্য তাদের টিকে থাকা সহজ হয়েছে।



মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। মহান রক্ষুল আল-আমিনের এমন এক সৃষ্টি, যাদের তিনি দিয়েছেন অনবদ্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক। চিন্তা করো, পিংপড়া এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কতটা একতা নিয়ে চলাফেরা করে। তারা পথ হারালে পথের সন্ধানের চেষ্টা করে, টিকে থাকার জন্য বেছে নেয় কোনো এক নতুন দলকে। অথচ আমরা সৃষ্টির সেরা জীব, আমরা তাহলে কিভাবে ঐক্য ছাড়া টিকে থাকার কল্পনা করতে পারি! আমাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে প্রতিটি পদে পদে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের কোন ধরনের ঐক্য প্রয়োজন? নিজেদের মনগড়া ঐক্য? নাকি অহী প্রদত্ত ঐক্য? উত্তর দাঁড়াবে, আমাদের সেই ঐক্যের প্রয়োজন, যে ঐক্যের পথ দেখিয়েছেন সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান রক্ষুল আল-আমিন। আমাদের সকলের সে ঐক্যই প্রয়োজন, যে ঐক্য আমাদের রবের প্রতি আমাদের ভালবাসাকে আরো দৃঢ় করে। আর আমরা একে অপরকে বলতে পারি, উহিবুকা ফিল্হাহ (আল্লাহর জন্য ভালোবাসি)।

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে এবং তার অনুসারীরা চাহিবে তাওহীদের ঐক্যকে নিঃশেষ করে দিতে। কিন্তু আমাদের আল্লাহর নির্দেশিত সেই তাওহীদের ঐক্য-একাত্মতা অবশ্যই বজায় রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে। লড়াই করে যেতে হবে শয়তানের সাথে। সেই ঐক্য-একাত্মতায় আমরা কতটুকু অগ্রগামী হব? নিজে কতটা স্বচেষ্ট হব সেই ভাতৃত্ব রক্ষায়। নাকি শয়তানের ধোকায়

ভুলে যাব ইমানী-ভাতৃত্ব।

রবের ক্ষুদ্র সৃষ্টি পিংপড়ার নামে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে—সূরা আন নামল। এই ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে আমরা একতাবন্ধ হওয়ার শিক্ষা কি আদৌ গ্রহণ করতে পারব? নাকি হারিয়ে যাব সে পথে, যে পথ একা চলার জন্য অতীব সংকীর্ণ, হারিয়ে যাব তিমিরের অতলে? 'হাতে হাত রেখে চলো আলোর পাখিদের গানে শামিল হয়ে পথ চলি সে পথে, যে পথের ঐক্যের গান মিলেছে জান্নাতে।'

চিন্তা করো,
পিংপড়া এক ক্ষুদ্র
সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও
কতটা একতা
নিয়ে চলাফেরা
করো।



ଆତ୍ମ : ଧର୍ମୀୟ ବନ୍ଧନେର ଏକ ବୃଦ୍ଧ ପରିବାର।

ମୁହମ୍ମାଦ ଗୋଲାମ ରବାନୀ

ପ୍ରଥିବିତେ ମାନୁଷ ଏକାକୀ ବସିବାସ କରତେ ପାରେ ନା । ଜନ୍ମ ଥେକେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନସଫରେ ମାନୁଷକେ ହାଜାରଓ ପ୍ରୋଜନେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହୁଏ । ଦୁଃଖ-କଟ୍ଟ ଶେଯାର କରତେ ଏବଂ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ଭାଗାଭାଗି କରତେ ପ୍ରୋଜନ ହୁଏ ସହ୍ୟୋଗୀର । ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ା ଜୀବନ୍ୟାପନ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ।

ସମାଜେର ମଧ୍ୟେ ଆଲ୍ଲାହ-ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ରାସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓ୍ୟାସାଲ୍ଲାମକେ ସ୍ଵିକୃତିଦାନକାରୀ ଦଲକେ ଆଲ୍ଲାହ ଭାତ୍ରେର ଏକ ନିୟମାତ ଦାନ କରେଛେ ।

କୁରାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ବଲେନ,

“ଆଲ୍ଲାହ ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ କରେଛେ ତା ମୟଳଣ ଯାଏଁ । ଏକଟା ମମୟ ଛିଲ, ଯଥନ ତୋମରା ଏକେ ଅନେକ ଶକ୍ର ଛିଲେ । ଅତଃପର ଆଲ୍ଲାହ ତୋମାଦେର ଅନ୍ତରମମୁହକେ ଜୁଡ଼େ ଦିଲେନ । ଫଳେ ତାଁର ଅନୁଗ୍ରହେ ତୋମରା ଜାଇ ଜାଇ ହୟେ ଗେଲେ ।”[୧]

লক্ষ্য করে দেখো, এই আয়াতে নিয়ামাহ বা অনুগ্রহ বলতে মুসলিমদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হৃদ্যতা বোঝানো হয়েছে।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন,

“মুমিনগন পরম্পর ভাই ভাই।”[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও নিজ শিক্ষাদানে ভাতৃত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। যাতে মুসলিমরা নিঃস্বার্থ সহযোগিতার মাধ্যমে একপ্রাণ হয়ে থাকে। সেজন্যই মুসলিমদের এক দেহের সাথে তুলনা করে বলেন,

“তুমি মুমিনদের দেখবে তারা পারস্পরিক দয়া-ভালোবাসা আর মায়া-প্লেহের বিষয়ে একটি দেহের মতো। দেহের একটি অঙ্গ যখন আপ্রস্তু হয়, তখন পুরো শরীরই অনিদ্রা ও জ্বরে আপ্রস্তু হয়ে পড়ে।”[৩]

বর্তমান সময়ে এমন বন্ধনের প্রতিচ্ছবি খুব কম। এর জন্য তোমাকে একটি কল্পনার জগতে যেতে হবে। সেই সোনালী যুগে। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের মাঝে ভাতৃত্বের যে নমুনা পেশ করে গেছেন, তা সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটো মানুষকে অবাক হতে বাধ্য করে। সহানুভূতি, আন্তরিকতা ও একে অপরের বিপদে তারা যেভাবে সহযোগিতার উদাহরণ রেখে গেছেন, তা ছিল এই হাদিসের বাস্তবরূপ। এবং আল্লাহর নিয়ামাতের সঠিক মর্যাদা রক্ষা।

কিন্তু পরবর্তীতে আমরা ধীরে ধীরে এই ভাতৃত্ব-কে টুকরো করতে শুরু করেছি। সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি দেশের নামে, কালের নামে, ভাষার নামে কখনো স্বাধীনতার নামে, কখনো-বা নিজেদের বংশীয় অভিজাত্য বা দলীয়-প্রীতির নামে। আল্লাহর অনুগ্রহের যথাযথ মূল্যায়ন না করলে সময়ের গতির সাথে তা ঠিকই হারিয়ে যায় কালের চোরাবালিতে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের প্রাচীর এর সাথে তুলনা করে বলেন,

“এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীরের নয়। যার একাংশ অপর অংশকে মজবুত ও সুদৃঢ় রাখে।”

তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।[৪]

অপৰ এক হাদিসে সম্পর্কের নমুনা তুলে ধৰে বলেন,

“স্মানদারদের সঙ্গে একজন মুমিনের সম্পর্ক হয়ে দেহের সঙ্গে মাথার সম্পর্কের নয়।
স্মানদারদের দুঃখ-কষ্ট ঠিক সেভাবেই সে অনুভব কৰবে, যেমন মাথা দেহের যথা অনুভব
কৰে।”[৫]

ঈমানী ভাতৃত্বের এই প্রাচীরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো শর্তের সাথে
জুড়ে দেননি। সীমান্তের কাঁটাতার অথবা সংস্কৃতির অজুহাতে এই প্রাচীরকে দুর্বল করা
যাবে না। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে মুসলিম ভাই বিপদে পড়লে, অপৰপ্রান্তের মুসলিমরা
নিজের বিপদ মনে করে চিন্তিত ও অস্তির হবে; এটাই ভাতৃত্বের দাবি।

তবে তোমাদের মনে রাখতে হবে ভাইয়েরা, দুনিয়া হলো ভুল-ভাস্তি আৱ স্থলনের
জায়গা। এখানে তোমার-আমার-আমাদের মুসলিম কোন ভাই-বোনের দ্বাৱা ভুল হয়ে
যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ধোঁকায় পড়ে যে কেউ অপকর্মে জড়িয়ে পড়তে পাৱে। যদি
কোনো ভাই যুলুমের মতো মারাত্মক অপরাধ কৰে ফেলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কৰো, সে জালিম হোক বা
মাজলুম। সাহাবিৱা জিজেস কৱলেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
মাজলুম-কে সাহায্য কৱাৰ বিষয় বুৰুলাম। যালিমকে কি কৰে সাহায্য কৱবো। তিনি
বলেন, তুমি তাৱ হাত ধৰে তাকে (যুলুম থেকে) বিৱত রাখবে। [৬]

গুনাহে লিঙ্গ হয়ে গেলে তাকে নাসীহাহ কৱা। তিৱক্ষণ না কৰে নম্র জবানে তাকে
বোঝানো। তোমার তিৱক্ষণ শুনে সরাসৰি সে দুঃখ প্ৰকাশ না কৱলেও মনে-মনে আহত
হবে। এতে কৰে ভাতৃত্ব ও হৃদ্যতাৰ পৱিবেশ নষ্ট হবে। পারস্পৰিক ভাতৃত্ববোধ নষ্ট হয়
এমন যেকোন কাজ থেকে দুৱে থাকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেৱ
আদেশ কৱেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“তোমৱা অন্যেৱ ব্যাপারে আহেতুক অনুমান থেকে বিৱত থাকো। কেননা আহেতুক অনুমান বড়
মিথ্যাচাৱ আৱ তোমৱা কাৰোৱ দুৰ্বলতা ও দোষ অনুসন্ধান কৱতে যেয়ো না। অন্যেৱ উপৱ
প্ৰাধান্য লাভেৱ আকাঙ্ক্ষা কোৱো না, পৱন্পৱ হিংসা-বিদ্বেষ রেখোনা এবং একজন অন্যজন
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আল্লাহ-ৱ বান্দাৱা! তোমৱা পৱন্পৱ ভাই-ভাই হয়ে থাকো।”[৭]

এই হাদিসে মুসলিমদের হৃদ্যতায় ভাটা পড়ে এমন অনেক বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন। সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন 'দলীলবিহীন অনুমান'-কে। এটা এমন জঘন্য কাজ, যা ঘৃণা ও শক্তির অন্যতম কারণ। এর বিপরীতে একটি দুর্বল বর্ণনায় পাওয়া যায়, সাভাবিকভাবে একজন মানুষের প্রতি সুধারণা পোষণ করাও উত্তম ইবাদাতের মধ্যে গন্য।[৮] শুধুমাত্র কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কাউকে মন্দ বলা যাবে না।

হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে, “তোমরা ভাই-ভাই হয়ে থাকো”। এর দ্বারা বোঝা যায়, অন্তর থেকে যখন তোমরা এই বদ-অভ্যাসগুলো দূর করতে পারবে, তখনই তোমরা পরম্পর প্রকৃত ভাই-ভাই হয়ে থাকতে পারবে। ভালোবাসার সম্পর্ক শক্ত করতে ব্যাপক সালামের প্রসার করবে। শ্রম, অর্থ, অথবা সহানুভূতির দ্বারা তোমার মুসলিম ভাইয়ের বিপদে পাশে দাঁড়াবে। তার প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবে। সাক্ষাতের সময় চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখবে।

হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“তোমার ভাইয়ের সামনে হাস্যজ্জ্বল মুখ নিয়ে উদ্পন্নিত হবে, এটা তোমার জন্য সদকান্ধরণ।”[৯]

প্রিয় ভাইয়েরা! এটাই হলো ইসলামের উত্তম চরিত্র। গভীর রাতে আল্লাহর সামনে অশ্রু ঝরানো আর দিনের আলোতে মুখে মুচকি হাসি রাখা। ইসলামের দেখিয়ে দেয়া এই আত্মের সেতুতে ভর করে তুমি, আমি এবং আমরা যথাযথভাবে চলতে পারলে নিঃসন্দেহে গড়ে উঠবে এক সোনালী সমাজ। মুমিনদের সমাজ।

তথ্যসূত্র:

১. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১০৩
২. সূরা আল-হজুরাত, ৪৯ : ১০
৩. বুখারি (৬০১১)
৪. বুখারি, (২৪৪৬)
৫. মুসনাদ আহমাদ (২২৮৭৭), মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৩৫৫৫৭), সুনান সাউদ ইবনে মানসুর (১২৪৬)
৬. বুখারি(২৪৪৮)
৭. বুখারি (৬০৬৪)
৮. আবু দাউদ (৪৯৯৩), ইবনু হিব্রান (৬৩১), মুসনাদে আহমাদ (৭৯৫৬)। বর্ণনাটি দুর্বল।
৯. তিরমিয়ি(১৯৫৬), সহীহ ইবনে হিব্রান, (৪৭৮)

সৌরজগতে গ্রহ কয়টা?

মাহফুজ দিপু

আচ্ছা কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় "সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা কত?" তাহলে তার উত্তর কি হবে? আরে এ তো একেবারে সহজ। ৮টা। সৌরজগতে তো ৮ টাই গ্রহ আছে। বৃধি, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, ইউরেনাস, নেপচুন। কিন্তু এই একই প্রশ্ন তুমি যদি তোমার মা-বাবা কিংবা বয়সে একটু বড় কাউকে করো, তাহলে সে হয়তো উত্তর দিবে, সৌরজগতে গ্রহ মোট নয়টা। এর মানে কি আগে একটা বেশী ছিল এখন কমে গেছে? না, আসলে ব্যাপারটা তেমন না। এখানে সংখ্যার এই কমবেশটা আসলে সৌরজগতের ছোট্ট এবং কিউট গ্রহ 'প্লুটো'কে নিয়ে। প্লুটোকে একসময় গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এখন তাকে সরাসরি গ্রহের কাতারে ফেলা হয় না। বরং এখন তাকে বলা হয় সৌরজগতের বামন গ্রহ। মানে দূধে-ভাতে গ্রহ আরকি!



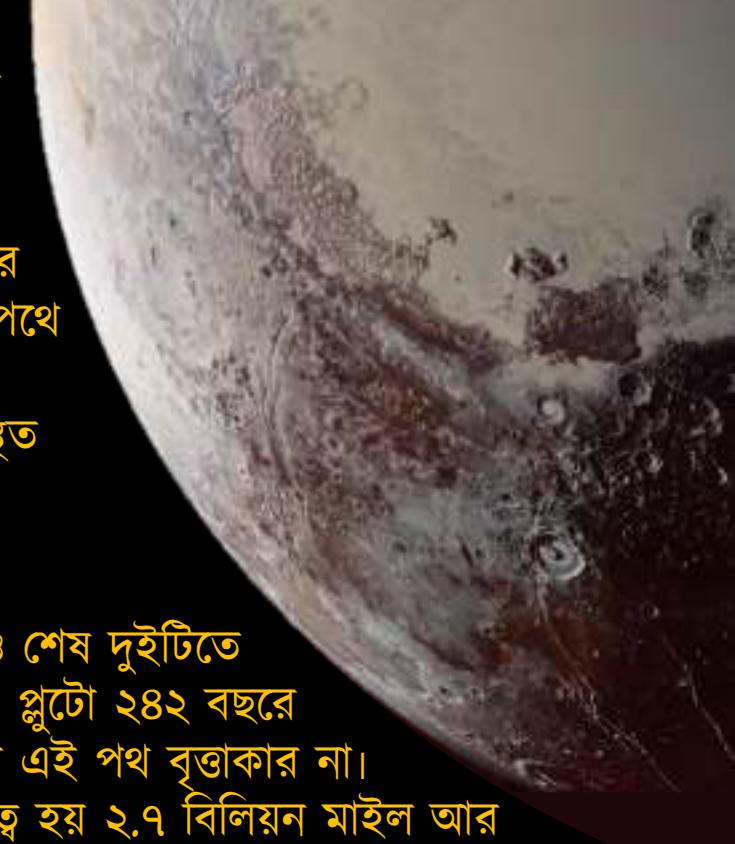
কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে গ্রহের মর্যাদায় থাকা প্লুটোকে কেন হঠাতে করে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো? জানতে ইচ্ছে করে না? এর আগে চলো জেনে নেই প্লুটোর পিছনের ইতিহাস। হঠাতে করে যেমন প্লুটোকে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো, তেমনি হঠাতে করেই আবিষ্কার হয়েছিল প্লুটো।

১৯০৪ সালে সৌরজগতের ৭ম এবং ৮ম গ্রহ ইউরেনাস ও নেপচুন আবিষ্কারের পরই বিজ্ঞানিরা এদের গতিপথে কিছুটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেন। তারা ধারণা করেন কোনো বড় গ্রহ এর আসেপাশে অবস্থান করার কারণে তার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাবে হয়তো এই অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানিরা জান প্রাণ দিয়ে খোঁজা শুরু করেন এই গ্রহকে। তারা সবাই মিলে এ অজানা গ্রহের নাম দেন "প্ল্যানেট এক্স"। কেউ কেউ একে "নাইনথ প্ল্যানেট" বলেও ডাকতো। বছরের পর বছর খোঁজার পরেও কিছু না পেয়ে বিজ্ঞানিরা একপ্রকার আশা ছেড়ে দেন। এর মাঝে এ প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানি পারসিভেল লোভেক মারা যান ১৯১৫ সালে। তার মৃত্যুর পরে এই প্রকল্প কিছুটা দমে যায়। পরবর্তীতে ১৯২৯ সালে এ প্রকল্পের দ্বায়িত্বপালন মার্কিন শখের জোতির্বিদ ক্লাউড টমবো।

১৯ ইঞ্জির একটি টেলিস্কোপ আর ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলা শুরু করেন তিনি। টানা একবছর ছবি তোলার পর অবশ্যে ১৯৩০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি তার পরিশ্রমের ফল পান। তার টেলিস্কোপের সাহায্যে তিনি একটি নিখুঁত বিন্দু সনাত্ত করেন যেটি নিজ কক্ষপথ বরাবর সরে যাচ্ছে। মজার ব্যাপার ১৯১৫ সালে একবার এবং ১৯১৯ সালে একবার প্লুটোর ছবি তোলা হয়েছিল কিন্তু এর এত ছোট আকার দেখে বিজ্ঞানিরা একরকম তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ক্লাউডের আবিষ্কারের মাসখানেক পড়ে তিনি তা প্রকাশ করেন।

সারা বিশ্ব থেকে সংগীতিত ৩ লক্ষাধিক নাম থেকে "প্লুটো" নামটি নির্ধারণ করা হয়। প্লুটো মানে হচ্ছে 'পাতালের দানব'। সৌরজগতের সবচেয়ে কনিষ্ঠ এই ছোট গ্রহটিকে ভালোবেসে ফেলে সবাই।

১৯৪০ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত গ্রহ হিসেবে থাকার পর বিপত্তি শুরু হয় ২০০৩ সালে। যখন প্লুটোর থেকে মাত্র ১২ হাজার মাইল দূরে এর থেকেও বড় একটা গ্রহ সদৃশ্য বস্তু আবিষ্কার করা হয়। যার নাম সংক্ষেপে "জেনা"। প্লুটোকে যদি গ্রহ বলা হয় তাহলে এর থেকে বড় বস্তুটিকেও গ্রহ বলতে হবে। এই সমস্যার সমাধানে জোতির্বিদদের সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন' সিদ্ধান্ত নেন



কোনো বস্তুকে গ্রহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত মানতে
হবে। প্রথমত, সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূরতে হবে।
দ্বিতীয়ত, যথেষ্ট পরিমাণ ভর থাকতে হবে, যেন
তার অভিকর্ষীয় শক্তির মাধ্যমে নিজেকে গোলাকার
আকার ধারণ করাতে পারে। আর তৃতীয়ত, কক্ষপথে
ঘোরার সময় তার আশেপাশের শক্তিশালী বলের
প্রভাব থাকতে হবে যেন তার আশে পাশে অবস্থিত
ঘূর্ণনে বাধা সৃষ্টিকারী বস্তু সমূহ দূর হয়ে যায়।

প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে পাশ করে গেলেও শেষ দুইটিতে
এসে আমাদের প্লুটো বেচারা একেবারেই ফেল। প্লুটো ২৪২ বছরে
সূর্যকে কেন্দ্র করে একবার ঘূরে আসে। কিন্তু তার এই পথ বৃত্তাকার না।
মারাত্তক চ্যাপটা। সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের দূরত্ব হয় ২.৭ বিলিয়ন মাইল আর
সবচেয়ে দূরের দূরত্ব হয় ৪.৫ বিলিয়ন মাইল। তারপর আবার সৌরজগতের সব নিয়ম
কানুন ভেঙ্গে সে ঘূরতে ঘূরতে চুকে পড়ে নেপচুনের কক্ষপথে। এ অবস্থায় প্লুটোকে তো
আর গ্রহের তালিকায় রাখা যাচ্ছে না।

মানসম্মান ডুবতে থাকা প্লুটোর শেষ আশাও ভেঙ্গে দেয় নাসার ভয়েজার রোভারটি।
প্লুটোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে কিছু ছবি তোলে যেখানে প্লুটোর একটি উপগ্রহকে
দেখা যায়। অঙ্গুতভাবে প্লুটোর উপগ্রহই প্লুটোর চেয়ে দিগ্নণ বড় যা গ্রহের শর্ত
বিরোধী। এসব দিক বিবেচনা করে ২০০৬ সালের ২৪ শে অক্টোবর প্লুটোকে গ্রহের
তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এবং এরপর থেকে সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮
টি।

কিন্তু মজার বিষয় কি জানো? সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা কিন্তু এখনো ফিরুড় না। নাসা
নিজেই স্বীকার করেছে সৌরজগতে আরো একাধিক গ্রহ থাকার সম্ভাবনার কথা। কে
জানে হয়ত আমাদের নানি-পুতিরা তাদের বইতে পড়বে ৯ টি, ১০টি বা তারও বেশি!!!

তথ্যসূত্র

আরো একটুখানি বিজ্ঞান।

ডিভিউ

পড়তে পারো নিচের বইগুলো



বই : অশ্বসাগর

লেখক : ইমাম ইবনুল জাওয়ী রাহিমাত্তুল্লাহ

প্রকাশনী : কুহামা পাবলিকেশন

প্রতিটি ভোর নিয়ে আসে নতুন আলো। করে দেয় আমাদের নতুন কিছু পাথেয় জোগাড় করে নেওয়ার সুযোগ। এ সুযোগ কেউ কাজে লাগায়, ফলে সে ধন্য হয়। আর কেউবা বরাবরই বিমুখ থাকে, চলে উল্টো পথে আর নিমজ্জিত হয় পাপের সাগরে। কেউ আবার গুনাহের কর্দমা লেপে নেয় সর্বাঙ্গে। ময়লার আবরণে দেহমন সব কদর্য হয়ে পড়ে। এমন মানুষগুলো আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

কিন্তু তারা সংশোধিত হতে চাইলে আল্লাহ কি তাদের দূরে সরিয়ে দেন? উভোটা আমাদের ভালোভাবেই জানা। না, মহান রব তাদের দূরে সরিয়ে দেন না। বরং যারা আপন চোখ থেকে প্রবাহিত করে অশ্বধারা, তাওবা করে ফিরে আসে মহান রবের কাছে, তারাই তো সেসব মানুষ, যারা মহান রবের নৈকট্যশীল বান্দায় রূপান্তরিত হয়। কারণ, তারা যে প্রিয় রবের কাছে সুপথ পেতে বইয়ে দিয়েছে অশ্বসাগর, অনুশোচনার সাগরে হাবুড়ুর খেয়ে চেয়েছে তারা ক্ষমা ও করুণা...

ইমাম ইবনুল জাওয়ী রাহিমাত্তুল্লাহ পাপের কদর্যতা তুলে ধরে, পাপাচারের নর্দমা থেকে দূরে থাকার প্রেরণা জুগিয়ে তাঁর হন্দয়ের নিবেদন পেশ করেছেন যে গ্রন্থটিতে, যাতে তিনি তুলে এনেছেন তপ্ত অশ্বধারা বয়ে দেওয়া এমন কিছু মানুষের কথা, যারা একসময় পাপাচারে লিঙ্গ ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাওবার পথ ধরে আলোকিত জীবন লাভে ধন্য হয়েছেন, হয়েছেন মহান প্রতিপালকের নৈকট্যশীল ও প্রিয়তম বান্দাদের অন্তর্গত; সেসব নিবেদন ও আখ্যানে রচিত অনবদ্য একটি বই ‘বাহরাদ দুমু’।

‘অশ্বসাগর’ বইটি ‘বাহরাদ দুমু’ বইয়ের অনুবাদ। বইটি গুনাহে নিমজ্জিত নিরাশ বান্দাদের জন্য হবে আশার আলো, দিগন্বন্ত পথিকদের জন্য হবে পথের দিশা, আর দ্বীনের রাজপথে চলতে ইচ্ছুক ভাইদের জন্য হবে শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ইনশাআল্লাহ, বইটি তোমার অন্তরকে বিগলিত করবে, মনকে করবে আখিরাতমুখী আর সেমানে আনবে দৃঢ়তা।



বই : হিজাব আমার পরিচয়
লেখক : জাকারিয়া মাসুদ
প্রকাশনী : সমর্পণ প্রকাশন

হিজাব শুধু একটা জামা না। এটা একটা জীবন-পদ্ধতি। যে নারী এটা পরবে, সে তার আদর্শিক পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরবে। প্রত্যেক মুসলিম মেয়েকে চেনা যায় তার সমৃজ্জুল ব্যক্তিগত দিয়ে। লজ্জাশীলতা ও উভয় চরিত্র দিয়ে। আর এসবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে হিজাবের মাধ্যমে। পর্দানশীল মেয়েরা এই বার্তা দিয়ে যায় যে, তারা অন্যান্যদের থেকে আলাদা। চিন্তা-চেতনা, চাল-চলন, ঝুঁটি ও মননে তারা অনেক উঁচু মাপের। সন্তান। তাদের জীবনযাত্রা মানুষের জন্যে অনুসরণীয়, অনুকরণীয়।

হিজাবকে পাঠানো হয়েছে আসমানের ওপর থেকে। সে তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তোমার ঈমানি সন্তান পরিচয় বহনকারী। এটা একটা আদর্শিক পরিচয়। তুমি কোন জীবন-দর্শন অনুসারে চলো, তার পরিচয়বাহক। তুমি যে মুসলিম নারী, তার প্রকাশ ঘটে হিজাবের মাধ্যমে। হিজাব তোমার পরিচয়।

'হিজাব আমার পরিচয়' বইটি তোমাকে দরদমাখা ভাষায় বুঝিয়ে দেবে হিজাবের প্রয়োজনীয়তা, নিরসন করবে হিজাবের ব্যাপারে নানান সংশয়। হিজাবের প্রতি যত্নবান হতে বইটি তোমাকে অনুপ্রেরণা যোগাবে ইনশাআল্লাহ।

শব্দখেলা

১				২		৩	৪
৫		৬			৭		
		৮			৯		
							১০
	১১			১২			
১৩				১৪			

উত্তর পাঠাবে এই টিকাগাল
editor.sholo@gmail.com
মেইলের Subject এ অবশ্যই
“শব্দখেলা” কথাটি লিখতে হবো
বিজয়ী তিনজন পাবে “১০০ টাকা”
করে “পুরস্কার”।

উপর-নিচ

১. যিনি সর্বপ্রথম রাসূল (সাঃ) এর মিরাজের ঘটনা বিশ্বাস করেছিলেন। ২. যে মহিলা উভদ
যুদ্ধে শহিদ হামযা (রাঃ) এর কলিজা চিবিয়ে থান। ৩. সৃষ্টিকর্তা। ৪. Surface ৫. ইসলামি
বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে নবম মাস। ৬. পবিত্রতা। ৭. যার খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ।
৮. যে জাতিতে মুহাম্মাদ (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। ৯. সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থের মধ্যে
একটি।

পাশাপাশি

১. যে তিনি আয়াতের সূরার প্রথমে আল্লাহর অতিবাহিত সময়ের শপথ করেছেন। ২. আল্লাহর
সন্তুষ্টির জন্য কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে মুসলমানদের দেশে গমন করা। ৩. মুসলমান ও
কাফিরদের প্রথম প্রধান যুদ্ধ। ৪. যে শহরে রাসূল (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ৫. যারা হজ
পালন করেন। ৬. যে মক্কী সূরার নামের অর্থ হচ্ছে মাকড়শা। ৭. যাকে রাসূল (সাঃ) মৃত
ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। ৮. আল্লাহর ওহি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য
নবি-রাসূলগণের কাজ বা দায়িত্ব।

আমাদের এক্স্ট্রিভিটি পাঠকের অনুভূতিতে ঘোলো (ফেব্রুয়ারী-২০২১)



ভালোবাসার ব্যাকরণ ভুলে যাওয়া আমাদের এই নতুন প্রজন্মকে ভালোবাসার আদি ও অকৃত্রিম পাঠ মনে করিয়ে দিতেই আমাদের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার আয়োজন ছিল ভালোবাসা নিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, আয়োজন সফলতার সাড়াও পেয়েছি। অনেক পাঠকই হৃদয়ের গহীনে লুকোচুরি করা অনুভূতিগুলো তুলে ধরেছেন সাবলীল ভাষায়।

ঘোলো,
হাজারো ঘোলোকে আলোর দিশা দিয়ে,
অক্লান্ত দেহে ছড়িয়ে দিয়েছ ভালোবাসার চিঠি।
তোমাকে দেওয়ার মতো নেই কিছু এই পথিকের-
একটাই শুধু চাওয়া,
যেয়ো না কখনো ছেড়ে, থেকে আমার পাশে
সারাজীবন যাবো তোমায় রবের জন্য ভালোবেসে।

-মুহাম্মাদ মাস্টিদ আল মাহাফ হৃদয়

"প্রথমে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী"—প্রবাদটা কতটা সত্য আমি জানিনা তবে নিউজফিডে প্রথম যেদিন তোমার ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদ দেখলাম, চোখে যে প্রশান্তি এবং পড়ার জন্য মনে যে তৃষ্ণা অনুভব করেছিলাম তা এখনো ভুলিনি। নিজে থেকেই তোমার গ্রন্থে জয়েন করলাম, ডাউনলোড করে পড়ে ফেললাম।

-খুশবু খুশি মীম

'ঘোলো-ফেরুয়ারি' পড়ার পরেই মনে হলো যে "ওরা" দারুণ কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শেয়ার না করলেই নয়। "ওরা" আমার বান্ধবী, পরিচিতদের "ঘোলো ভাইবোন"। ফেরুয়ারি সংখ্যা প্রকাশিত হবার ৪ দিনের দিন মনে এ ভাবনার উদয় হতেই বান্ধবীদের দিয়ে দিলাম প্রতিটি সংখ্যার লিংক। এ মুহূর্তে তাদের অনুভূতি ছিলো ভালোবাসাময়। আরো একটি সুপ্ত বাসনা মনে রয়েছে - কাছের কিছু ছোট ভাই-বোন যারা স্মার্টফোনের ছোঁয়ার বাইরে, তাদেরকে ঘোলোর বাস্তব ছোঁয়া দিতে।

-মারিয়াম বিনতে থাশেম

যখন দেখি শুধু মাত্র এর হার্ড কপি না থাকার কারণে সবাই আবার ছাই পাশ "কিআ" কিনে পড়ছে তখন হৃদয়ে আবার রক্ত ক্ষরণ হয়। দয়া করে আমাদের হৃদয় এর রক্ত ক্ষরণ গুলো বন্ধ করুন ভাইয়ারা! আমরা আপনাদের কাছে দাবি রাখলাম, আর কোনো পাঠক এর যাতে হৃদয়ে আঘাত না লাগে, যাতে আর কেউ অভিমান না করে টাকা দিয়ে যখন "মুক্ত বাতাসের খোঁজে" কিনেছি তখন আপনাদের ম্যাগাজিন আরো আগে কিনব।

-ইমরান আহসান

ফিতনার চূড়ান্ত সময়ে সবাই যখন জীবন উপভোগের নামে জাহানামের অঙ্ককার কালো আগুনে ঝাপ দেবার আয়োজন চালাচ্ছে, ঠিক সেই একই সময়ে কিছু মানুষ আধুনিকতার নামে এই নোংরা জাহিলিয়াতকে ছুড়ে ফেলে আল্লাহর পবিত্র রহমতের চাদরে আবৃত হয়ে সবকিছু পেছনে ফেলে ছুটে চলার চেষ্টা করে যাচ্ছে "জান্নাত" নামের সেই গন্তব্যের দিকে, যার প্রশংস্ততা আসমান-জমিনের ন্যায়, সেই মানুষগুলোর সীরাতুল মুস্তাকিমের চলার পথের এক বন্ধ হতে এসেছে প্রিয় "ঘোলো"। জাহিলিয়াতের চোরাবালিতে আটকে যাওয়া বহু যুবক ভাই-বোনদের গর্ত থেকে টেনে তুলতে এসেছে "ঘোলো"।

-হুসাইন মোহাম্মদ তানভিন

দুরন্ত কৈশোরের রোমাঞ্চকর সব বাঁকে যেসব মায়াবী ফাঁদ রয়েছে, সেখানেই পড়ে হাবুড়ুরু খাচ্ছে আমাদের উঠতি তরুণরা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের আলোকবর্তিকা এইসব চঞ্চল কিশোর কিশোরীদেরকে অঙ্ককার চোরাবালিতে সত্য পথের সন্ধান দিতেই যাত্রা শুরু 'ঘোলো' ম্যাগাজিনের। ছোট ছেট পায়ে এসে ফেরুয়ারিতে পদার্পণ করেই বিরাট চমক নিয়ে আসলো এটি; তাইতো আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই সংখ্যাটিই সেরা।

-শাহরিয়ার রিফাত

কিশোর বয়সে আবেগ-উদ্দীপনার মাত্রা থাকে তের বেশি। কল্পনায় নানান ভাবনা এসে বাসা বাঁধে। যুক্ত হয় সময়ের সাথে 'তাল মিলিয়ে' চলার অড্ডুত খায়েশ। এমন অনুভূতিকে আমরা মাঝেমধ্যে অভিহিত করি 'ভালোবাসা' হিসেবে। সত্য বলতে, তা মোহ বৈ কিছু না। মূল্যবান জীবনকে সন্তা আবেগের কাছে শেষ করে দিয়ে জীবনের খেই হারিয়ে ফেলার নাম নাকি প্রেম! অপাত্রে আবেগ বিসর্জন দেয়া বিবেকবান মানুষের দ্বারা হতে পারে না। যারা অবুরুমনে জড়িয়ে পরে ভ্রান্তির স্তোতে, নিজেদের ওপর কোনো কন্ট্রোল থাকে না তাদের। শয়তানের দেখানো এ পথে শেষমেশ সুখের দেখা মেলে না কোনো। কোমলমনা ক্ষুদ্র মনগুলির রক্ষার্থে ঘোলো ম্যাগাজিনের এই মহৎ উদ্যোগের জন্য আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম জায়া দান করুক।

-আহমান ফাহিম

ঘোলোর ফেরুয়ারি সংখ্যার কথা কি আর বলব, প্রচন্দ দেখেই মন ভরে যায়। সবগুলো অধ্যায়ই ছিলো পড়ার মত! কোনটা রেখে কোনটার কথা বলব? “ভালোবাসা আজকাল” অধ্যায়ে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরাটাকে খুবই ভালো লেগেছে। তবে সবচেয়ে বেশি ভালো ছিল “যেন পূর্বের কোনো জন্মে ছিলো প্রেমের পাওনা দেনা” অধ্যায়টি।

-শাহনাজ খুশি

পাঠ অনুভূতি প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা হচ্ছে :

প্রথম : মুহাম্মাদ সাঈদ আল সাহাফ হৃদয়

দ্বিতীয় : মারিয়াম বিনতে হাশেম

তৃতীয় : শাহনাজ খুশি

চতুর্থ : খুশবু খুশি মীম

বিজয়ীদের অভিনন্দন।
আর ভালোবাসা? সে তো সবার জন্যই।

তোমাদের মধ্যে আরও অনেকেই অনুভূতি প্রকাশ করেছ, এখানে সবার লেখা প্রকাশ করতে পারছি না বলে আবার অভিমান করে বসো না। তোমাদের এই ভালোবাসা দেখে আমরা অনুপ্রেরণা পাই, সাহস পাই। আমরা স্বপ্ন দেখি তোমাদের সাথে নিয়ে দীর্ঘ পথ চলার, সোনালি সমাজ গড়ার। স্বপ্ন দেখি, ‘শোলো’ হবে বাংলার কিশোরদের এক জাগরণ। দুনে ধরা এই ভঙ্গুর সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে ‘শোলো’। তবে এবার আমরা সবার মনের একটা দাবি খুব করে অনুভব করছি, “শোলো ম্যাগাজিনের হার্ডকপি চাই!” এই দাবি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে শোলো। খুশি তো তোমরা?

আসন্ন রামাদান উপলক্ষে একটি বিশেষ হার্ডকপি আসবে ইনশাআল্লাহ। 'শোলো'-কে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব কিন্তু তোমাদেরই। স্বপ্ন বাস্তবায়নে শোলো'র সফরসঙ্গী হতে প্রস্তুত আছো তো তোমরা? আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

Illustrate Sholo (ফেব্রুয়ারি-২০২১)

এটি আমাদের প্রথম কন্টেস্ট। মূলত এটি ছিল শোলো ফেব্রুয়ারি সংখ্যার যেকোনো উক্তি ডিজাইন করার প্রতিযোগিতা। আলহামদুলিল্লাহ, ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। তোমরা যারা এক বুক ভালোবাসা নিয়ে ডিজাইন করতে নেমেছিলে, সবাইকে অনেক শুকরিয়া।

এই প্রতিযোগিতায় স্পন্সর হিসেবে ছিলেন আবদুর রহমান, আর বিচারক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন Do Halal Design (DHD) এর ভাইয়ারা। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। স্পন্সর এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী ৩ জনকে পুরস্কার দেবার কথা ছিল। সুখবর হচ্ছে, অতিরিক্ত আরও দুজনকেও পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা হলো:

প্রথম : জুবায়ের আহমেদ

দ্বিতীয় : নিশাত সাল সাবিল

তৃতীয় : সাওদা সিদ্দিকা নূর

এছাড়া বিশেষ বিবেচনায় পুরস্কার পেয়েছে যথাক্রমে মোহাম্মদ জায়েদ আল রাফি
এবং তাওহিদ খান অয়ন

অভিনন্দন বিজয়ীদের! প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিযোগির জন্য রইলো
অফুরন্ত ভালোবাসা মিশ্রিত দুআ। আজ এ পর্যন্তই। সামনে আরো দারুণ সব কন্টেস্ট নিয়ে
হাজির হবো ইনশাআল্লাহ।

এবারের সংখ্যা এই পর্যন্তই

তোমাদের ভালোবাসার ষালো মাননের
সংখ্যায় হার্ডকপি হিসেবে আসবে ,
ইংশা-আল্লাহ।

তোমরা প্রস্তুত তো?